পথ চলার গল্প কথা

পথ চলার গল্প কথা

অসীম শীল

বইওয়ালা প্রকাশন
প্রকাশনায় অন্য মাত্রা

পথ চলার গল্প কথা
অসীম শীল

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিণ, ১৪৩০

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
সৌম্য মুখোপাধ্যায়
বইওয়ালা প্রকাশন, ১৪১/এক্স/১বি গণপতি সুর সরণি,
কলকাতা ৭০০ ০৫০;
দূরভাষ : ৯৪৩২৩০০৬৬০
boiwalapublication15@gmail.com

I.S.B.N- 978-81-19522-11-8

প্রচ্ছদ
গীতশ্রী চ্যাটর্জী

অক্ষরবিন্যাস
প্রিন্ট অ্যান্ড গ্রাফিক্স

মুদ্রণ
বইওয়ালা প্রিন্টার্স

মূল্য : ২৩০ টাকা

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনো প্রতিলিপি অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত অমান্য হলে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যিনি পরম স্নেহে আমাকে সাধারণ মানুষের
মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি শ্রীমৎ স্বামী
দিব্যানন্দ। এই রচনা সংকলন তাঁর প্রতি
আমার সশ্রদ্ধ নিবেদন।

গল্প সূচি

আমসত্ত্ব ১১
বর্ণমালা ১৯
ভাত ২১
বিদেশ যাত্রা ২৫
বিনোদিনী ২৯
বুনো ৩৫
চিঠিওয়ালা ৪১
দশে দশ ৪৩
দেশ ৪৭
দুই বোন ৫৩
গানের সুরে ৫৪
গৌরনদী ৫৯
হাতঘড়ি ৬৩
হয়তো বা ৬৬
জন্মদিন ৬৯
কাঞ্চনজঙ্ঘা ৭১
কলকাতা ৭৫
পাদুকাগণিত ৮১
পারানির কড়ি ৮৫
প্রাণের মানুষ ৯০
সাম্পান ৯৭
সেলফি ১০১
শুভদৃষ্টি ১০৬
সৌরভ ১০৯
ঠিক ১১১
উৎসব ১১৩

লেখকের নিবেদন

আমার সম্পর্কে একটা কথা দীর্ঘকাল প্রচলিত, "ও তো ঘরেই থাকে না"। তবে যায় কোথায়? সে কৈফিয়ত তো দিতেই হয়। সত্যিই আমার ডাক্তারির পেশাটা হাসপাতালের পাঁচিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। চিকিৎসক জীবনের শুরুর দিকে রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে বিভিন্ন গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে মাঝেমধ্যেই যেতাম, পরে সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। ইছামতির নৌকায় যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজও চলছে বিভিন্ন রূপে। আমার পরম সৌভাগ্য যে অরবিন্দ আই হসপিটালে পড়ার সূত্রে তপস্বী অধ্যাপক ডাক্তার ভেঙ্কটস্বামীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছিল। যিনি শিখিয়েছিলেন নিজেদের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোটাও চিকিৎসার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তিন দশক আগে যখন শ্রী নাগরাজন মহাশয়ের উৎসাহে মেদিনীপুরের চৈতন্যপুর গ্রামে চোখের চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান গড়তে প্রয়াসী হলাম তখন থেকে প্রতি সপ্তাহেই কোন না কোন গ্রামে পৌঁছে যাওয়া একটা অত্যাবশ্যক কর্তব্যে পরিণত হয়ে গেল। এরপর দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণের কাজ করার ডাক আসতে থাকল।

যেখানেই যাই আর যে কাজই করি না কেন সবেতেই তো মানুষের উপস্থিতি। কত মজার ঘটনা ঘটত, কত বাধার সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু সবশেষে রয়ে গেছে আনন্দের স্মৃতি। তার মূল কারণ নানান মানুষের মধ্যে নিহিত রয়েছে বিচিত্র সব সৌন্দর্য যা শুধুমাত্র অনুভব করা যায়। এই ঘটনাগুলো নিয়ে পরিবার ও বন্ধুদের মাঝে গল্প করতাম। এতে আড্ডার আসরে আমার কদর কিঞ্চিত বৃদ্ধি পেতে থাকল।

আমার বিভিন্ন সময়ের সহপাঠীরা বিশেষ করে আর জি কর ও নরেন্দ্রপুরের বন্ধুরা ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে গেছেন এইসব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার জন্য। তবুও জড়তা কাটিয়ে কলম ধরতে দেরি করেছি। একদিন একজন রোগীর জীবনের ঘটনা মনকে এমন আলোড়িত করলো যে লিখতে বাধ্য হলাম। সেই লেখার শুরু।

যাঁর কথা আলাদা করে না বললেই নয় তিনি হলেন সাহিত্যিক শ্রী শ্যামল সেনগুপ্ত। ক্রমাগত প্রেরণা দিয়েছেন লেখার জন্য। ওনার দৃষ্টিতে ঘটনাগুলো নবীন প্রজন্মের কাছে বার্তাবহ।

"ডাক্তারবাবু, গল্প চাই" বলে যার দাবি আমাকে থামতে দেয় না তিনি মহিষাদলের সাংবাদিক শ্রী সুজিত ভৌমিক। ওনার তাগাদায় বেশ কিছু রচনার সৃষ্টি।

এই বইতে যে সব কাহিনী সংকলিত হয়েছে সবকটাই বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি। সব ঘটনার মধ্যেই মানুষের কোন না কোন সুন্দর রূপ উপলব্ধি করেছি।

আমার লেখার অবসর মেলে ট্রেন বা বিমানে দীর্ঘ যাত্রার সময়। ফিরে এসেই প্রথম শ্রোতা হন আমার স্ত্রী শুভ্রা ও আমার মা। প্রথম মতামত এদেরই কাছে পাই। সব কিছু সামলানোর সাথে সাথে লেখাগুলো মলাটবন্দী করার দায়িত্ব আমার সকল গল্পের সঙ্গী শুভ্রাই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই বইওয়ালা প্রকাশনীর শ্রী সৌম্য মুখোপাধ্যায়কে আমার ইচ্ছাকে রূপদানের জন্য।

সর্বোপরি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য আমার বিভিন্ন গল্পে উপস্থিত মানুষ আর আড্ডার শ্রোতাদের। বর্তমান ব্যস্ত জীবনে কোন কাহিনী যদি পাঠকের মনে কিঞ্চিত রেখাপাত করে তবে লেখক কৃতার্থ হবে।

কলকাতা
মহালয়া, ১৪৩০

বিনীত–
অসীম শীল

আমসত্ত্ব

"ওহ্, দারুণ টেস্ট!" মহেন্দ্র আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বর্ষার রাতে ঝরঝরে গরম ভাতে ধোঁয়া উঠছে, তাতে যদি ইলিশ ভাপা পড়ে তাহলে কে আর না খুশি হয়? আগরতলার রাজধানী হোটেলে বসে আমরা সবাই মিলে রাজকীয় খাবার খাচ্ছি, কিন্তু উপভোগ করতে পারছিনা। আগামীকাল থেকে কঠিন সময় শুরু হতে চলেছে সেই চিন্তাই মনে বাসা বেঁধেছে। বিকেলে আমাদের সম্পাদক মহারাজ পুলিশের বড়কর্তাকে ফোন করেছিলেন স্পেশাল প্রোটেকশনের জন্য-পাওয়া যায়নি।

২০০৩ সালের ত্রিপুরা - আইন শৃঙ্খলা খুবই বিপর্যস্ত। প্রায় পুরো রাজ্যটাই উগ্রপন্থী কার্যকলাপের আতঙ্কে ডুবে আছে। বছর দুই আগে আমাদের দল সফলভাবে ওড়িশা আর বাংলায় দৃষ্টিহীনতা শুমারী করেছে; এবারও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে কাজ করতে আহ্বান করেছেন। বাংলা ভাষার কারণে স্বাভাবিক ভাবেই বাংলার দলকে ত্রিপুরা যেতে হচ্ছে। সার্ভে মানে নূতন দেশ দেখা আর তার সাথে এবার উপরি পাওনা আমার সহকর্মী ছেলেগুলোর বিমানে চড়ার সুযোগ। আজ বিকেলের একটু আগে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে আমরা ছয়জন আগরতলা পৌঁছেছি - দু সপ্তাহ এখানে কাজের পরিকল্পনা।

সমস্যার গন্ধ বেশ কয়েক মাস আগেই পেয়েছিলাম। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল সার্ভেটা রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে ধলাই জেলাতে হবে। আমার সহকর্মী ডাক্তার জয়ন্ত ত্রিপুরার ছেলে, ধলাই নামটা দেখেই ও আপত্তি করল। ওই জেলাতেই তখন সবচেয়ে বেশী সমস্যা আছে বলে শোনা গিয়েছিল। সরকারের কাছে বিষয়টা নজরে আনাতে সার্ভের স্থান বদল করে উত্তর ত্রিপুরা করা হল। ঠিক হল কৈলাশহরে জেলা সদরে থাকা আর বিভিন্ন জায়গায় মোট পঁচিশটা গ্রামে গিয়ে মানুষের চোখ পরীক্ষা করা হবে। সাধারণত সার্ভে খুব আনন্দের হয় - নূতন স্থান, নূতন মানুষের সান্নিধ্য উপভোগ করতে করতে শরীরের পরিশ্রম গৌণ হয়ে যায়। এবারে উপভোগের জায়গাটা প্রতিস্থাপিত হয়েছে আতঙ্কের দ্বারা - তাই অভিজ্ঞতা একেবারে অন্যরকম।

পরদিন সকাল আটটার মধ্যে চাকমাঘাট পৌঁছাতে হবে। আগের দিন সন্ধ্যাতেই তাই দুটো বোলেরো গাড়ি ধর্মনগর থেকে আগরতলা পৌঁছে গেছে। এখানে আমাদের অভিভাবক দিলীপদা যিনি বই এর ব্যবসার কারণে পুরো রাজ্যটাকে খুব ভালোভাবে চেনেন। দাদা জয়ন্তর পূর্বপরিচিত, উনিই ভেবে চিন্তে উত্তর ত্রিপুরা থেকে গাড়ি ভাড়া করেছেন।

দুটো গাড়িতে ভাগ হয়ে আমরা তেলিয়ামুড়া হয়ে খোয়াই নদীর ধারে চাকমাঘাটে

পৌঁছালাম। সেখানে রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এক প্রস্থ তল্লাশি হল। এক সেনা অফিসার আমাদের গাড়িদুটো লাইনে রাখতে বললেন। আধ ঘন্টা বাদে প্রায় ষাট সত্তরটা গাড়ির এক কনভয় উত্তর ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা - মিছিলের সামনে বন্দুক উঁচিয়ে জওয়ানরা চলছে, পিছনেও তাই। আর একটা সাঁজোয়া গাড়ি মাঝে মাঝেই পিছন থেকে সামনের দিকে গিয়ে তদারক করছে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ি রাস্তায় ঘন সবুজ গাছ দুই পাশে–এমন নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য যেন চোখের দেউড়ি পেরিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারছে না। একটু পরপরই দেখতে পাচ্ছি টিলার উপরে বা বড় গাছের ডালে বসে বন্দুক হাতে সৈনিকরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কনভয়ের দিকে তাকিয়ে আছে; প্রবল বর্ষায় ভিজলেও কর্তব্যে ত্রুটি নেই।

বৃষ্টির তেজ আরো বেড়ে গেল। আমরাও গাড়ির কাঁচ তুলে দিলাম একটু ফাঁক রেখে। আমার হাতে একদিনের পুরনো একটা বাংলা খবরের কাগজ - মাঝে মাঝে চোখ বোলাচ্ছি। একটা খবরে চোখ আটকে গেল, "বাঙালির পাত থেকে বড় ইলিশ উধাও" - খোকা ইলিশে আর মন ভরছে না। তাই এই প্রতিবেদনে ভোজনবিলাসীর শোক, বিশেষজ্ঞের মতামত, মৎস মন্ত্রীর বিবৃতি - সবই আছে। মনে হল, আচ্ছা এই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যে সৈনিক যুবকরা আমাদের রক্ষা করছে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বাঙালি আছে। তারও নিশ্চয় মনে হচ্ছে এমন বর্ষার দিনে গরম গরম খিচুড়ি মা পাতে ঢেলে দিচ্ছে আর তার সাথে ইলিশ ভাজা - আহা! তারপরই একটু দিবানিদ্রা। কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন।

ঘন্টা দুয়েক চলার পর হঠাৎ সব গাড়ি থেমে গেল। আমাদের ড্রাইভার আজিজ বলে উঠল,"নিশ্চয় কোন গাড়ি খারাপ হইসে।"

- গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে তো দলছাড়া হয়ে যাবে। তখন কি হয়?

"প্রথমে সারবার জন্য আধা ঘন্টা সময় দিবো। না হইলে সেই গাড়ি থাকবো; আর তার লগে দুই জন মিলিটারি পাহাড়া দিব। অতিরিক্ত টাকা দেওয়া লাগবো।"

–ও তাই? ভগবান, আমরা যেন ঠিকঠাক যেতে পারি।

- চিন্তা নাই স্যার্ , গাড়ি পুরা সার্ভিসিং করা আসে। বেশ খানিক সময় হয়ে গেল এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি আমরা। একজন বয়স্ক ড্রাইভার এসে বললেন, "ধস পড়সে সামনে, বর্ষাকাল তো। এইরকম হইলেই ভয়, বোঝলেন। কোথা থিক্যা আইস্যা গুলি চালাইয়া দেয়, অগো মাথার তো ঠিক নাই। আবার কখনো ধইরা নিয়া গিয়া মুক্তিপণ চায়, মাইরাও দেয়।" ভদ্রলোক নানান লোকের মুখে শোনা বিভিন্ন ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলেন, কলকাতার চায়ের দোকান হলে হয়ত 'তারপর? তারপর', বলে প্রশ্ন করে যেতাম। আরও দুকাপ চা বেশি খাওয়া হয়ে যেত। এখানে এই মুহূর্তে কোনরকম নৃশংসতার কথা শুনতেই মন চাইছিল না।

ধস পরিস্কার হতে গাড়ির দল আবার চলতে শুরু করল। মাঝখানে আমবাসাতে স্বল্প বিরতি - বলা যেতে পারে পাইন্যাপল-ব্রেক। ঝুঁটি ধরে ছাল ছাড়ানো ছোটো ছোটো রসাল সুগন্ধী আনারস গোটা খাবার স্বাদ সারাজীবন মনে রাখার মতন। আরও কিছু যাবার পর কুমারঘাটে পৌঁছে গাড়িগুলোকে স্বাধীনভাবে যেতে দেওয়া হলো। আমরাও বিকেলের আগেই কৈলাশহর সার্কিট হাউসে পৌছালাম। বুকিং সরকারই করে রেখেছিল। বিশাল বিশাল ঘর আরামে থাকার আদর্শ পরিবেশ; কিন্তু সেই একই কথা – আতঙ্কিত মন। পথে আসতে আসতে চিন্তা আরো বেড়েছে বই কমেনি।

সরকারি কাজে এসেছি, জেলাশাসককে জানানোটা প্রাথমিক কর্তব্য। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আফিসে ছিলেন না। আমাদের এক কর্তাব্যক্তি নিয়ে গেলেন পুলিশ সুপারের আফিসে। একজন নবীন আফিসার চেয়ারে-সমাদর করেই বসালেন। পিছনে দেওয়ালে পূর্বসূরিদের তালিকা এবং কার্যকালের মেয়াদ দেখেই একটু চিন্তিত হয়ে গেলাম। তখন জুলাই মাস; জানুয়ারী থেকে সাত মাসে বেশ কয়েকজন সুপার বদলি হয়েছেন। উনি আই বি অফিসারকে ডেকে আমাদের নির্বাচিত (Random Selection) গ্রামের তালিকা নিয়ে আলোচনায় বসলেন। খুব চিন্তিত দেখলাম ওদের। পেনসিল দিয়ে কাটাকুটি করে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "Doctor, we cannot allow you to enter four clusters even with maximum security. In the rest twentyone you have to move with caution. In fact no one is completely safe. Each day you should report to local police station before you start the survey work."

অফিস থেকে বেরোবার সময় একজন সাধারণ ভদ্রলোক আস্তে করে আমার কানের কাছে এসে বললেন,"আপনারা কোথায়, কবে যাবেন খবরটা কিন্তু জায়গা মত পৌছাইয়া গেল।" আতঙ্ক পিছু ছাড়ে না। তবুও কাজ তো করতেই হবে। আসার আগে রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলাম। উনি আগে ত্রিপুরায় ছিলেন। ওনার কথাটাই কানে বাজতে থাকল। "তোমাদের পরিচয় হবে ডাক্তারের বা চিকিৎসাকর্মীর, কিছু সাধারণ ওষুধ সাথে রাখবে। দেখবে কেউ ক্ষতি করবে না।" এই আশ্বাস বাক্যে মন শক্ত করলাম।

রাতের খাবার আর পরদিনের প্রাতরাশ সার্কিট হাউসে বেশ ভালই হলো। আমরা ঠিক করলাম সরকারি ভবনে বেশি থাকব না। কৈলাশহরের কাছাকাছি ক্লাস্টারগুলো একটু খেটেখুটে কম সময়ে শেষ করে ধর্মনগর চলে যাব। মনে হয়েছিল সরকারি ভবনের চেয়ে সাধারন হোটেল বেশি নিরাপদ।

প্রথমেই গেলাম একটা চা বাগানে, যত দূর মনে পড়ে নামটা ছিল হালাইচেরা টি গার্ডেন। চা বাগান এমনিতেই চোখ জুড়ানো হয়, তার উপর উঁচু নিচু টিলার উপর যদি

এমন প্রকৃতির সবুজ চাদর বিছানো থাকে তবে তার রূপই আলাদা। কুলি বস্তিতে সার্ভে শুরু হল।

– কি নাম মা?

– কমলা ভূমিজ এক লম্বর।

– এক নম্বর কেন?

– দুইটা ঘর এগিয়ে যাও, ওখানে দুই লম্বর থাকে।

ও মা! দুই বৃদ্ধাকে দেখলে মনে হয় যেন দুই বোন। চা বাগানের হাজিরার খাতায় সেই কবে যে নামের শেষে সংখ্যা একটা বসেছে সেটা দুজনেই স্বচ্ছন্দে বয়ে চলেছেন। আমরা নিয়ম অনুযায়ি পঞ্চাশোর্ধ জনা পঞ্চাশেক মানুষের দৃষ্টি ও চোখ পরীক্ষা করলাম। কোন সমস্যা ছাড়াই প্রথম ক্লাস্টার শেষ হলো।

দুপুরের মধ্যেই একটা জায়গার কাজ শেষ হতে আমরা তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে পরবর্তী গ্রামে পৌঁছে গেলাম। জায়গাটা একদম বাংলাদেশের বেড়ার ধারে বলা যায়। এই পাড়াটাতেও লোক বসতি ঘন, তাই পঞ্চাশ জনের চোখ দেখতে বেশি সময় লাগল না। জয়ন্ত প্রস্তাব করল আজই সার্কিট হাউস খালি করে ধর্মনগর চলে যাওয়া যাক। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাবে যে। পুলিশের নির্দেশ আছে যা কিছু মুভমেন্ট সব দিনের আলোতেই করতে হবে। ঠিক হবে কি যাওয়া? আমাদের দুই সারথি আজিজ ও দীপুদা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিয়ে আমাকে বলল,"স্যার, চুপ চাপ বসবেন, কোন কথা কেউ কইবেন না গাড়ি চলার সময়।"

– তাই হবে।

– তবে আর দেরি নয়। গাড়িতে উঠেন।

ভাঙাচোরা রাস্তার উপর দিয়ে দুজনেই অসম্ভব জোরে গাড়ি ছোটাল। প্রায় ঘন্টাখানেক ছুটলাম। উনকোটি মন্দির পার হয়ে গেল। খুব বিখ্যাত অনন্য এক দেবালয় বলে জানি, কিন্তু আমরা একটা শব্দও উচ্চারন করলাম না, মন্দির নিয়ে কোন আলোচনা এই সময়ে নয়। রাস্তায় আর তৃতীয় কোন গাড়ি নেই।

যখন ধর্মনগরে ঢুকলাম তখন সন্ধ্যার আঁধার নেমে গেছে। পুলিশ শহরে ঢোকার মুখে গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, মৃদু তিরস্কার জুটল, "পাগল যত সব। এই সময় এই রাস্তায় অন্ধকারে কেউ ঝুঁকি নেয়?" যাক ভাগ্য ভালো বিপদ কিছু হয়নি। এস পি সাহেবের চিঠি থাকায় ড্রাইভারদের বকাঝকা বিশেষ শুনতে হলো না। উনকোটি হোটেলে আস্তানা নেওয়া হল। আগামি কিছুদিন এটাই আমাদের ঘরবাড়ি।

খুব ক্লান্ত, তবুও পুরো ব্যাপারটা দিল্লীতে আমাদের সরকারি কর্তাদের জানাতে তো হবে। শহরের একটা STD booth থেকে অনেক কষ্টে যোগাযোগ করা গেল। ড. বাচানি বারবার বলতে লাগলেন, "Be safe, be safe, my friend. You can increase

the sample size in safe clusters."

কাজ চলতে থাকল। প্রতিদিন বেশ সকালেই ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে যাই। প্রথমেই যাই পুলিশ স্টেশনে। থানার অফিসার বলে,"ড্রাইভার কে ডাকেন।" চালক আসলে সবাই প্রায় একই নির্দেশ দেন,"পূর্ব দিকে বাজার, এর ওপারে আর যাবে না। বর্ডারের দিকে একেবারেই নিয়ে যেওনা ইত্যাদি ইত্যাদি।" সারাদিন আমরা কাজ করি - টিলায় চড়ি আর নামি। যে বাড়িতেই যাই বাটায় করে পান আর জলের গ্লাস এগিয়ে দেয়। পিঁড়ে পেতে বসতে বলে। নিখুঁত ভাবে নিকানো উঠোনের দিকে তাকিয়ে থাকি মুগ্ধ হয়ে। উঠোন পেরোলেই আনারসের ঝাড় আর বেড়ার ধারে কাঁঠাল গাছের সারি - পাকা ফলের গন্ধে চতুর্দিক মম করে। দিনের শেষে যখন হোটেলে ফিরতাম তখন বাজার থেকে থলে ভর্তি আনারস নিয়ে ঢুকতাম। কর্মীদের কেউ যত্ন করে সেগুলো কেটে একটা স্টীলের গামলা ভরে ধরে দিয়ে যেত। সবাই মিলে চারদিকে বসে আনারসের রসে প্রাণ জুড়াতাম। এটাই ছিল দিনের শেষে সঞ্জীবনী সুধা।

সব দিন সমান যায় না। একদিন আসাম সীমান্তে চুরাইবাড়িতে হাইওয়ের পাশে একটা ধাবায় দুপুরের খাবার খেতে বসেছি – টেবিলে নুন, লঙ্কার সাথে ছোট বাটিতে আচারের মত শুঁটকি মাছ শোভা পাচ্ছে। হঠাৎ পিছন থেকে কাঁধের উপর এক অপরিচিত হাত স্পর্শ করল।

"আই কার্ড দিখাইয়ে।" গম্ভীর গলায় উর্দি পরিহিত একজন জওয়ান আমার পরিচয় চ্যালেঞ্জ করেছে। খুব যে ঘাবড়ে গেছিলাম এমন নয় কারণ কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি তো ছিলই। ব্যাগ থেকে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সব কাগজই এক এক করে দেখালাম। ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "হামেশা ইয়ে সারে পেপারস সাথ মে রাখনা।" শুটকির আমেজটাই চটকে গেল।

বেশ কদিন হয়ে গেল। নূতন রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সেরকম বিপদে এখনো পড়িনি তাই দুঃসাহস একটু মনের কোনে উঁকি মারতে লাগলো। জয়ন্ত বললো, "স্যার, শুধু সহজ ক্লাস্টারেই সার্ভে হবে? একটু দূরের গ্রামে যাব না?"

- চাইছো? দিলীপদার সাহায্য নাও। এখানে তুমিই তো আমাদের চরণদার। দিলীপদা দশদা লক্ষ্মীপুরে যোগাযোগ করে বর্মনবাবু বলে জনৈক শিক্ষকের সাথে কথা বললেন। ভদ্রলোক আশ্বাস দিলেন যে আমরা পৌছাতে পারলে উনি সার্ভের ব্যবস্থা করে দেবেন। লক্ষ্মীপুর ত্রিপুরার পূর্ব দিকে মিজোরাম সীমান্তের একটা গ্রাম - জম্পুই পাহাড়ের কোলে। আমাদের তালিকায় এই গ্রামটা ছিল, কিন্তু নিরাপত্তার কথা ভেবে পিছিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জয়ন্ত একটু চিন্তিত দেখলাম, কিন্তু উৎসাহের ঘাটতি নেই। প্রস্তুতি হিসাবে সন্ধ্যাবেলা পেঁচারথল থানায় ফোন করা হল। ওনারা সাহায্য করতে রাজি হলেন; থানায় ঠিক পৌনে সাতটায় পৌছাতে বললেন। এদিকে পরের দিনের

অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনে কমল খুব ভয় পেয়ে গেছে। শুধু বলছে,"কেন ত্রিপুরায় আসতে গেলাম?" আলোক আর মহেন্দ্র ওকে সাহস যোগাচ্ছে। কমলের রাতের খাওয়া গেল!

সকাল ছটা চল্লিশেই আমরা আসাম - ত্রিপুরা হাইওয়ের ধারে পেঁচারথল পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

– আমরা বড় বাবুর সাথে দেখা করতে পারি?

– উনি ডিউটি শেষ করে বাসায় চলে গেছেন। আপনাদের কি প্রয়োজন ?

আমরা সার্ভের কাজে দশদা লক্ষ্মীপুর যাবার ব্যাপারে....

– হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি জানি। আমরা রেডি। ড্রাইভারকে ডাকুন।

– দীপুদাকে আলোক ডাকতে গেল। পাশের ঘর থেকে কয়েকটা খট্ খট্ আওয়াজ পেলাম। উকি মেরে দেখি বন্দুকে গুলি লোড হচ্ছে। নিজের হৃদয়ের শব্দ যেন একটু শুনতে পেলাম এবার। আমাদের সারথি দীপুদা সামনে আসতেই থানার মেজবাবুর নির্দেশ,"গাড়ি ফিট আছে তো? তোমার গাড়ি আগে যাবে, আমাদের গাড়ি পিছনে। দুইটা গাড়ির মধ্যে মোটামুটি পঞ্চাশ মিটার দূরত্ব থাকবে। রাস্তা ফাঁকা থাকলেও বেশি আগাবা না। মাছমারা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যাবার সময় দুই গাড়ির মধ্যে যেন কখনো যোগাযোগ না হারায়, সাবধান থাকবা।"

মনে প্রশ্ন অনেক, তার চেয়ে বেশি ভয়, কিন্তু মৌনতা ছাড়া এখন পালনীয় অন্য কিছু নেই। অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ির দিকে এগোলাম। আমাদের বোলেরোর পিছনেই দাঁড়িয়ে পুলিশের মারুতি জিপসি; তাতে ছাদ ফুঁড়ে দুজন সান্ত্রী মেশিনগান উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের রক্ষা করার জন্য। গাড়ি ছাড়ল, ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ গাছে মোড়া টিলার মধ্য দিয়ে এগোতে থাকলাম। প্রকৃতির অকৃপন সৌন্দর্য চতুর্দিকে, কিন্তু হৃদয়ের জানালাটা ঠিক খোলা যাচ্ছে না। মনে মনে ভাবছি কখন মাছমারা পেরিয়ে যাব। জায়গাটা ছাড়িয়ে গেলাম কী না সেটাও দীপুদাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছে না। পিছন ফিরে মাঝে মাঝে দেখছি পুলিশের গাড়িটা দেখা যাচ্ছে কি না। এরকম ভাবে ঘন্টা খানেক যাবার পর পুলিশের ইঙ্গিতে পাহাড়ের উপরে একটা চওড়া সমতল জায়গায় গাড়ি দাঁড়ালো। একজন অফিসার এগিয়ে এসে বললেন, "যান, আর অসুবিধা হবে না। এই খামটা কাঞ্চনপুর থানায় দিয়ে দেবেন।"

- তার মানে এখন ওখানে রিপোর্ট করতে হবে?

– হ্যাঁ, ওরা আপনাদের বাকি পথের ব্যবস্থা করে দেবেন।

যেখানে গাড়িটা দাঁড়ালো সেই জায়গাটা অনেকটা ভলিবল কোর্টের মতন, তিন দিকে পাহাড় আর দূরে ছোট একটা নদী দেখা যাচ্ছে। অন্য কোথাও হলে এরকম জায়গায় নিশ্চিত কিছুটা সময় কাটিয়ে ছবি না তুলে যেতাম না। এখন সেটা ভাবাই

অবান্তর।

আপাতত মনটা অনেকটাই চিন্তা মুক্ত, তাই অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম।

– আচ্ছা, আমার ধারনা ছিল পাইলট কার আগে যাবে আর আমরা পিছনে থাকব; যেমনটা ভি আই পি দের ক্ষেত্রে আমরা দেখে অভ্যস্ত।

আসলে ডাক্তারবাবু, এটা পাহাড়ী রাস্তা, নিয়মটা অন্য। আপনাদের গাড়ি যদি বিপদে পড়ে তাহলে আমরা সামনে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যেতে পারবো। আগে থাকলে পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি ঘুরিয়ে পিছনে আসা সবসময় সম্ভব নয়।

– আর পঞ্চাশ মিটারের ফাঁক কেন?

–ওহ। আমাদের পুলিশের গাড়ি সবসময়ই উগ্রপন্থীদের টার্গেট; তাতে বোমা মারলে কাছাকাছি থাকলে আপনাদের বিপদ ঘটতে পারে। পঞ্চাশ মিটার তফাতে থাকলে আপনারা বেঁচে যাবেন। আমাদের গাড়ি বুলেট প্রুফ, আপনাদের নয়। আর পঞ্চাশ মিটারের বেশী হলে পাহাড়ী রাস্তায় হদিশ রাখা যায় না। ও সব চিন্তা করবেন না, ডাক্তারবাবু। কাজ ভালভাবে সেরে আসুন, আমার কলিগরা সাহায্য করে দেবে।

– অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।

অল্প সময়ের মধ্যেই কাঞ্চনপুর থানায় পৌছে গেলাম। চিঠিটা হাতে দিতেই জনৈক পুলিশকর্মী সাংকেতিক ভাষায় কোথাও কিছু বললেন - বোঝার উপায় নেই। এবার একজন পুলিশ অফিসার এসে বললেন, "এখন আপনাদের এসকর্ট দরকার নেই। এই চিঠিটা লক্ষ্মীপুরে ত্রিপুরা স্টেট্ রাইফেলসের অফিসে গিয়ে দেবেন। পৌঁছে গেলাম দশদা লক্ষ্মীপুর। এখানকার পরিবেশটা ঠিক থানার মতন নয়। বেশ কিছু খাকি হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা ছিপছিপে চেহারার যুবক ক্যাম্প চত্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওখানকার অফিসার চিঠিটা হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন মেপে নিলেন। বলে উঠলেন, "এনারই বেশি প্রটেকশন দরকার।

ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" কী বলে রে বাবা! আমার আবার বিশেষ কি? না, জিজ্ঞাসা করার সময় এটা নয়। একটা ট্রে তে করে কয়েক গ্লাস কোক এল আমাদের আপ্যায়নের জন্য। চুমুক দিয়ে শেষ করতে না করতেই দেখি বারোজন সেমি-কম্যান্ডো ইউনিফর্ম পরে বন্দুক নিয়ে তৈরি। একজন মাঝ বয়সি পিস্তলধারী দেহরক্ষী আমার জন্য বরাদ্দ হলো। কোন দিকে হাঁটব ঠিক হয়ে গেল। বলা হলো নদীর উপর যে ছোট ব্রিজটা ধরে মিজোরামের দিকে রাস্তা গেছে সেদিকে যেন আমরা না যাই।

ছোট পাহাড়ি নদী কুলকুল বয়ে যাচ্ছে, দূরে জম্পুই পাহাড় ঘন সবুজ। বর্ষণসিক্ত গাছগুলো চকচক করছে, পিছনে নির্মল নীল আকাশ। মন আর প্রাণের আরামের এর বেশি আর কী আয়োজন হতে পারে? অন্য চিন্তা দূরে সরিয়ে সার্ভের কাজে মন দেওয়া

যাক। এখানে সব বাড়িগুলোই সমতলে, তাই অন্য জায়গার মতন টিলায় ওঠা নামা নেই। একের পর এক গৃহস্থের ঘরে ঢুকছি। দৃষ্টি পরীক্ষা চলছে চার্ট ধরে, চোখে টর্চের আলো পড়ছে। বাটায় পান সেজে কেউ দাঁড়িয়ে আছে অতিথির সমানে। অত পান খাওয়া চলে না, এগিয়ে দেওয়া গ্লাস থেকে জল একটু পান করছি। সাথে যে কোন নিরাপত্তারক্ষী আছে একবারও মনে হচ্ছে না, কারও চোখ মুখ দেখে 'নিরাপদ নই' এমন মনে করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। জম্পুই পাহাড় সামনে, কত নাম শুনেছি এর। এখানকার কমলা লেবু বিখ্যাত, প্রকৃতিপ্রেমিকদের কাছে জম্পুই এক স্বর্গ। বিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেতের শেষে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি কিন্তু যেন ষোল আনা উপভোগ করতে পারছি না।

সার্ভের কাজ প্রায় শেষের মুখে - বাঁশের বেড়ার গেট খুলে একটা বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। উঠোনটা বেশ বড়; তার তুলনায় বসত ঘরটা ছোটই বলতে হয়। টিনের দেওয়াল আর টিনের ছাদওয়ালা বাড়িটার দরজায় এক বৃদ্ধা সাদা কাপড় পরে বসে আছেন। চোখ পরীক্ষার কথা বলতে সাগ্রহে রাজি হলেন। দেখা শেষ হতেই আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, চোখ ভালো আসে (আছে) তো?

'একদম তাজা আছে দিদা', মজা করে বললাম।

'সুখে থাকো বাবা', মাথায় হাত দিয়ে বৃদ্ধা আশীর্বাদ করলেন। আলোক চার দিকটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। আমাকে এসে বললো, "স্যার, উঠোনে তারে মেলা ছোট ছোট গামছার মত ওগুলো কি? ডান দিকে তাকিয়ে দেখি সারি দিয়ে আমসত্ত্ব শুকাচ্ছে। বললাম,"মেদিনীপুরে এইরকম কখনো দেখনি না? তাই বুঝতে পারছ না।"

"ওখানে তো থালায় শুকোতে দেখেছি", আলোক বলে। বৃদ্ধা আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন, হেসে বললেন, "খাইবা বাবা?" উত্তরের অপেক্ষা না করেই দৌড়ে গিয়ে বেশি শুকনো একটা তোয়ালের মাপের আমসত্ত্ব ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমাদের দিতে লাগলেন। "পোলাপানে খাইবো না তো বানাইসি ক্যান?" তা ওনার বয়সের কাছে আমরা পোলাপানই বটে। সবাই একসাথে বড় বড় আমসত্ত্ব টুকরো মহানন্দে চেটে যাচ্ছি আর চোখে মুখে তৃপ্তির পূর্ণতা নিয়ে এক মানবী তাকিয়ে তাকিয়ে তা উপভোগ করছেন। শাশ্বত মাতৃস্নেহের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল এটাই সত্য, এ পর্যন্ত যা ঘটেছে সব সর্বৈব মিথ্যা।

বর্ণমালা

'বর্ণ' কথাটির কতরকম অর্থ হয়। বর্ষার আকাশে যখন নানান রং পাশাপাশি হাত ধরে রামধনু তৈরী করে তখন তাকে যথার্থই বর্ণমালা বলা হয়। বিদ্যাসাগর মশাই যবে থেকে বাঙালির বর্ণপরিচয় ঘটিয়েছেন তবে থেকে আমরা বর্ণ বলতে প্রথমে অক্ষরকেই বুঝি। একদিন এই বর্ণ শব্দটি আমার জীবনে একটা অভূতপূর্ব উপলব্ধি এনে দিয়েছিল। বর্ণমালার মধ্যে যে এত উচ্ছ্বাস লুকিয়ে থাকে সেটা সেদিন জেনেছিলাম।

বেশ কয়েকবছর আগের কথা। আমরা হাওড়া জেলার শিশুদের চোখের চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত। প্রায় জনা তিরিশ বাচ্চাকে নির্বাচন করা হল চোখের অপরেশনের জন্য। বেশির ভাগের চোখেই ছানি অপরেশনের প্রয়োজন ছিল। নির্ধারিত দিনে অভিভাবকসহ ওদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হল এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী যার যা চিকিৎসা প্রয়োজন তা সম্পন্ন হল। তালিকা মিলিয়ে দেখা গেল শ্যামপুর থেকে একটি মেয়ে আসেনি, নাম পল্লবী। তখন মোবাইল ফোনের এতটা ব্যাপক প্রচলন ছিল না তাই বাচ্চাটার খোঁজও নেওয়া গেল না।

চিকিৎসা সমাপন করে নির্বিঘ্নে বাচ্চারা সব হাওড়া ফিরে গেছে প্রায় এক সপ্তাহ হল। আমি হাসপাতালে বসে রোগী দেখছি। এমন সময় এক অল্পবয়সি মহিলা তার শিশুকন্যাকে নিয়ে উপস্থিত। এই তো সেই পল্লবী, এত দিনে এসেছে। জীবনে প্রায়শই হয়, চট করে আমরা মেজাজ হারিয়ে ফেলি। এমনটা আমারও ঘটল। পল্লবীর মাকে এক নিশ্বাসে আমি বকাবকি করে দিলাম দেরী করে আসার জন্য।

"জানেনা একটা বাচ্চার অপেরশনের জন্য কতটা প্রস্তুতি দরকার। সবার সঙ্গে আসলে তো গাড়ি ভাড়াটাও বাচঁত, ইত্যাদি, ইত্যাদি -"।

মুখ নীচু করে লিখে যাচ্ছি কাগজে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র। ভাবছি যা হোক বাচ্চাটা যখন এসেছে ব্যবস্থাতো কিছু করতেই হবে। এই গরীব অশিক্ষিত মানুষগুলোর এই জ্বালা। ঠিকমতো দিন তারিখ মনে রাখতে পারেনা। ফুটফুটে বাচ্চাটা দেখলেও মায়া হয়। আদর করতে ইচ্ছা হয়। এত কথা বললাম, কই মায়েরতো কোন সাড়াশব্দ নেই? মুখ তুলে চাইতেই মনে বড় একটা ধাক্কা খেলাম। অঝোর ধারা মায়ের দুচোখ বেয়ে পড়ছে। নিজেকেই আপরাধী মনে হতে লাগল। নিজেকে সামলে নিয়ে পল্লবীর মা বলল, "ডাক্তারবাবু, আপনারা সব বিনাপয়সায় করে দিলেও আমারও তো হাতে দু-পাঁচ টাকা রাখতে হয় বাড়ির বাইরে আসলে। সেটুকুও আমার কাছে ছিল না। ওর বাবা মদ খায়, সংসার দেখে না। আমাকে লোকের বাড়ি কাজ করে কটা টাকা জোগাড় করে তবে আসতে হয়েছে"।

এরপর আর কথা চলে না। আগামী কদিন আমাদের কর্তব্যের পালা। পল্লবীর একটা চোখের ছানি অপরেশন হল। প্রত্যাশিত ভাবেই দৃষ্টি এল। মায়ের মুখের হাসি আমাকে অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি দিল। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার সময় বারবার বুঝিয়ে বলা হল যেন যথা সময়ে আবার এসে দেখিয়ে যায়। আমাদের এক কর্মী আবার কিছু টাকা মায়ের হাতে গাড়ি ভাড়া বাবদ দিয়ে দিলেন।

প্রায় মাস খানেক পরের কথা। অপরেশনের পর দ্বিতীয়বার পল্লবী দেখাতে এসেছে দাদুর কোলে চেপে। এখনো মনে পড়ে গোলাপী রঙের ফ্রক, মাথায় লাল ফিতে, চোখে ছোট্ট সানগ্লাস। নার্সদের কোলে আদর খেয়ে পল্লবী আমার কাছে এল। ভালোই আছে। এবার থেকে ও চশমা পরবে। দাদুকে বুঝিয়ে দিলাম চিকিৎসার সব নিয়মকানুন এবং সাবধানতা।

দাদুর চোখে যেন একটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস দেখা যাচ্ছে। আমাকে বললেন - "ডাক্তারবাবু আপনি একটা চোখের ব্যবস্থা করেছেন আমি ওকে স্বরবর্ণ শিখিয়ে দিয়েছি। আর একটা চোখের অপরেশন করে দিন আমি ওকে ব্যঞ্জনবর্ণ শেখাবো।"

ভাত

-'হ্যালো, মন্টু ভাই বলছেন? ঝন্টু শেখের...'

-'হ্যাঁ, ও আমার ভাই। আপনি কে বলছেন?'

পরিচয় সূত্রটা ধরিয়ে দেবার জন্য আমাকে একটু বিশদভাবেই বলতে হল, - "মনে আছে এবছরই শীতের দিকে আপানার ভাই ঝন্টু শেখের হয়ে আমি ফোন করেছিলাম ব্যাঙ্গালোর থেকে?'

-"হ্যাঁ মনে আছে। আপনি কেমন আছেন? এতদিন বাদে ফোন করছেন; আমাদের মনে আছে তাহলে।'

কত ফোনই তো করা হয়। দরকারি সব নম্বর যন্ত্রে ধরা থাকে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনীয় নয় অথচ নম্বরটাকে সেভ করে রাখা সচরাচর হয় না। সেদিন কোনো কারণে ইচ্ছা হয়েছিল নম্বরটা তোলা থাক। মাদুরাই থেকে ব্যাঙ্গালুরু হয়ে কলকাতা ফিরছিলাম। মোবাইলে চার্জ দিতে হবে, জায়গা খুঁজছিলাম। এক ভদ্রলোক দেখিয়ে দিলেন। হিন্দিতেই কথা হল। ফোন চার্জে বসিয়ে অপেক্ষা করছি। সময় হাতে কিছু আছে। আশেপাশে লোকজনের চলাচল দেখতে লাগলাম। আমার পাশেই বসেছিল এক ইজরায়েলি যুবক- ভারত ভ্রমণে এসেছে। ওর খুব ঈচ্ছা উত্তর ভারতে হোলি আর হিমালয় দেখার। এই নিয়েই ওর সাথে নানান গল্প চলতে লাগল। গল্প করলেও যে ভদ্রলোক চার্জারের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন তার দিকেই বারবার চোখ যেতে থাকল। মানুষটাকে খুব বিধ্বস্ত লাগছিল; শুধু অসুস্থ নয়। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, পাতলা লম্বা গড়ন। এলোমেলো চুল আর খোঁচাখোঁচা দাড়িতে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। কখনো একটা পা মেলে দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে পাশ ফিরে স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করছেন, তবুও মনে হচ্ছে শান্তি পাচ্ছেন না।

বিমানে ওঠার ঘোষণা হয়ে গেল, ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিমানে যাত্রীরা আসন নিতেই ঘোষণা হল boarding complete. যে ভদ্রলোককে এতক্ষণ নিরীক্ষণ করছিলাম তিনিই আমার যাত্রাসঙ্গী হলেন। বিমানসেবিকা উপরে রাখা একটা থলে দেখিয়ে বললেন, 'এটা কাছে রাখুন। মনে হয় ফল আছে - অন্য ব্যাগের চাপে ক্ষতি হতে পারে।' ভদ্রলোক থলেটা নামিয়ে নিলেন। আমাকে হিন্দীতে বললেন যে ভিতরে কমলা আর কলা আছে। বিমান ছাড়ার আগে আমি বাড়িতে ফোন করলাম, যেমন সচরাচর পারিবারিক সংবাদ বিনিময় হয়ে থাকে। আমার বাংলা কথা শুনে আমার সহযাত্রীর মনে বল এল। অকপটে বলেই ফেললেন, 'দাদা একটা নম্বর দিচ্ছি, একটু আপনার ফোন থেকে ধরে দেবেন?'

-'অবশ্যই, বলুন।'

-'বলবেন, ঝন্টু কথা বলতে চায়।'

ফোনে নম্বর লাগালাম। ওদিকে যিনি ধরলেন তিনি একজন মহিলা; ঝন্টুকে চেনেন বলে মনে হল না। রং নাম্বার - উল্টে দুটো বিরক্তির কথা শুনিয়ে দিল।

ভদ্রলোককে খুব অসহায় মনে হল। স্বগতোক্তির মতন বললেন, 'ভাইকে খবর দিলে ভাতটা রেঁধে রাখত।' আবার একটা ফোন নম্বর দেখিয়ে আমাকে বললেন, এটা আমার ভাই-এর হতে পারে।' আমি বললাম, "দিন না চেষ্টা করে দেখি, আপনার ভাইকে ধরা যায় কিনা।' ততক্ষণে প্লেনের চাকা গড়াতে শুরু করে দিয়েছে। অনুচিত হলেও ফোন ধরার চেষ্টা করলাম। 'ভাত' কথাটা যেন আমাকে ধাক্কা মারছিল। পেয়েও গেলাম ঝন্টুর ভাই মন্টুকে। আকশে ওড়ার আগে ঝন্টু একটা বাক্যই বলতে পারল, "দশটা নাগাদ পৌছাব, ভাত রেঁধে রাখিস।'

আমাদের তিন আসনের সারিতে মাত্র দুজন ছিলাম, তাই কথা বলতে সুবিধা হল।

-'আসছেন কোথা থেকে?"

-'দুবাই।'

-'খাননি কিছু?'

-'যে বিমানে এলাম তাতে খাবার কিনে খেতে হয়। টাকাকড়ির টানাটানি, তাই ক'টা ফল সাথে নিয়ে প্লেনে উঠেছি। খেতে খেতে অম্বল হয়ে গেছে, আর খালি পেটে ফল সহ্য হচ্ছে না। কখন যে ভাত খাব? ঘুমও একদম হয়নি, মাথায় বড্ড যন্ত্রণা।'

-'কিছু ওষুধ দেব? আমি ডাক্তার।'

ঝন্টুবাবুকে অম্বল আর ব্যথার ওষুধ দিলাম। বললাম একটু পা ভাঁজ করে দুটো সিট জুড়ে শুতে। কষ্টের উপশম সহজ নয়। বুঝলাম শুধু শারীরিক নয়; কোথাও একটা প্রবল মানসিক যন্ত্রণা ঝন্টুকে গিলে খাচ্ছে। ভদ্রলোক কোনোরকমে আধঘন্টা চোখ বুজে থাকলেন। আমিও সিটপকেটে রাখা খবরের কাগজে চোখ বুলাতে লাগলাম।চোখ খুলেই বললেন, 'দাদা, খান না লেবু আর কলা।'

-'আপনি আগে খান, আপনার তো বেশি খিদে পেয়েছে। প্লেনের কিছু খাবার আপনাকে কিনে দিই?'

-'না, না, অম্বলের পেটে অন্য কিছু সহ্য হবে না। কখন যে ভাত পাবো?"

-'কোথায় থাকেন আপনি?'

-'সালার, মুর্শিদাবাদ। এক দালাল আরবে কাজ দেবে বলে নিয়ে গিয়েছিল। কথা ছিল দোকানে সেলসম্যানের কাজ করব। লাগিয়ে দিল কনস্ট্রাকশনে। রাজমিস্ত্রীর কাজ আমি জানি না। তাও আবার নিয়ে গেছে ট্যুরিস্ট ভিসায়। এখন খালি হাতে ফেরৎ পাঠাচ্ছে। অমার সব গেল!'

কপালে হাত দেয় ঝন্টু, গলা বুজে আসে। নিজের শরীরের কষ্টকে ছাপিয়ে গেছে মনের কষ্ট। মানুষটা আজ বিধ্বস্ত। দুচোখ ভরে জল - ডুকরে ডুকরে কাঁদছে এক শক্ত সমর্থ পুরুষ। পুরুষদের এমন সচরাচর কাঁদতে দেখা যায় না। একটা ভালো উপার্জনের আশায় ঘর ছেড়ে গিয়ে খালি হাতে প্রতারিত হয়ে ফেরার গ্লানি যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। মাঝেমাঝে বাচ্চাদের কথা বলছেন; খালি হাতে দাঁড়াতে হবে ওদের কাছে। বাবা হিসাবে সেই অপদার্থতা তাকে শঙ্কিত করে তুলছে। কথায় বুঝলাম দুবাই থেকে তার এই প্রত্যাবর্তন একেবারেই আকস্মিক, বাড়ির লোকের কাছে অপ্রত্যাশিত। অস্বস্তি তাই আরও বেশি।

সংসারে মেয়েরা নানান যন্ত্রণার শিকার - অশ্রুধারাই কোমল মনের প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। তাই তাদের কান্নাকে সমাজ স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়। কিন্তু পুরুষের দুঃখ সাধারণত চাপা থাকে। পুরুষ যেন ব্যর্থ হতে জানে না। এ তার পরাজয়ের কান্না। বহুসংখ্যক সাধারণ গরিব বাঙালিকে মধ্যপ্রাচ্যে কাজকর্মের জন্য যেতে দেখি। এদের প্রতি তথাকথিত বড়োলোকদের দৃষ্টিটা অন্যরকম। বিমানযাত্রীদের প্রচলিত প্রাপ্য ভদ্রতাও এদের কপালে সবসময় জোটে না। গরিব মানুষের ভাগ্য হিসাবেই এরা এটাকে মেনে নেয়। অনেকেই অভিবাসন ফর্ম পূরণ করতে অন্যের সাহায্য নেয়। সেটাও যে সবাই সহৃদয়ভাবে করে এমন নয়। এর উপর আছে দালালদের প্রতারণা - ঝন্টু শেখ যার অন্যতম শিকার। বিদেশে যেতে গেলে এত নথিপত্র যাচাই হয়, এদের কাজের নিশ্চয়তা আছে কিনা কেউ কি তা ভালভাবে দেখে না?

দমদমে বিমান নামল। ঝন্টুবাবু আবার আমার ফোনটা চেয়ে নিলেন। বেশ বুঝলাম ফোনের ওপারে ওঁর স্ত্রী। মুখ থেকে একটাই শুধু বাক্য বেরোল, 'তোমাদের জন্য কিছু করতে পারলাম না।' আবার কান্নায় কথা ডুবে গেল, শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' তেই উত্তর দিলেন। নিশ্চয় সহধর্মিণী তাকে সাহস যোগালেন। কথোপকথন শেষ হল এই বলে, 'কাল আর শরীরে কুলাবে না, পরশু বাড়ি যাব।' বিমানবন্দর থেকে আমি ট্যাক্সি নিলাম দক্ষিণ কলকাতার উদ্দেশ্যে। ঝন্টুকে মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে; তারপর গাড়ি ধরবে দক্ষিণেশ্বরের জন্য। ওখানে ওর ভাই মন্টু চাকরিসূত্রে থাকে। ট্যাক্সিতে প্রায় আধঘন্টা পথ চলে গেছি, মন্টুর ফোন এল আমার কাছে। কারণ ভাইকে খোঁজ করার আর কোনো উপায় তার ছিল না। বললাম, আশা করি এগারোটা নাগাদ ঝন্টুবাবু দক্ষিণেশ্বর পৌছে যাবেন, হয়তো লাগেজ আসতে বিলম্ব হয়েছে।

বাড়ি পৌঁছে আমিও একটু মুসুরডাল দিয়ে গরম ভাত খেলাম। কিছুদিন বাংলার বাইরে থাকার পর ঘরে ফিরে এই তৃপ্তির তুলনা হয় না। মনে হতে থাকল ঝন্টুর কথা। সুস্থভাবে পৌঁছতে পারল তো ভাইয়ের কাছে? ভাত নিশ্চয় রাধা ছিল। আহা কতদিন ভালো করে ভাত খায়নি মানুষটা! একটু পেটে ডাল-ভাত পড়লেই প্রাণ ফিরে পাবে।

পরদিন সকালে হাসপাতালে যেতে যেতে আমার সারথী সাবিরকে গতদিনের অভিজ্ঞতাটা বললাম। ভাবলাম - না, একবার খোঁজ নিই ঝন্টুর। ওর ভাই বলল, ঝন্টু ঘুমাচ্ছে। -'থাক, বিরক্ত করবেন না। ওকে ঘুমোতে দিন, পরে খোঁজ নেব।" আমি বললাম। সন্ধ্যায় আমার কাছে ঝন্টুর ফোন এল। গলায় কৃতজ্ঞতার সুর, 'আপনি আমার খোঁজ নিয়েছেন?"

-'হ্যাঁ, চিন্তা হচ্ছিল বলেই। কাল আপনাকে খুব অসহায় লাগছিল। ঘুম হয়েছে তো?" আরও কিছু কথা বলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে ফোন ছাড়লাম। মনে হল নম্বরটা সেভড রাখি। হয়তো আবেগবশতই করে ফেললাম।

অনেকগুলো মাস কেটে গেছে এর মধ্যে - বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা পার হয়ে এসেছে শরৎ। কদিন আগে কলকাতার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। পুজোর প্রস্তুতি চলছে পাড়ায় পাড়ায়। আলোয় সাজছে শহর। বাজারের ভিড়ে গাড়ির গতি শ্লথ। প্রয়শই দীর্ঘ গাড়ির যত্রায় আমি সময়ের সদ্ব্যবহার একটু অন্যভাবে করি। মনে করার চেষ্টা করি কার সাথে দীর্ঘদিন কথা হয়নি; ফোন করে তাদের খোঁজ নিই। হঠাৎ মনে হল ঝন্টুর কথা। মানুষটা ভাল আছে তো? মন্টুর নম্বরেই চষ্টা করলাম, পেয়েও গেলাম। পরিচয়সূত্র ধরিয়ে দিতেই মন্টুর সানন্দ বিস্ময় - 'আপনি আমাদের মনে রেখেছেন?" জানলাম, ঝন্টু আবার বিদেশে গেছে। এবারে চাকরি ভালো। বাহ্! পুজোর আগে ভালো খবর পেলাম একটা। ভালো খবর তো এখন দুর্লভ। আরও দু-চার কথা হল। মন্টু আবার বলে, "খুব আনন্দ পেলাম দাদা। একদিন দেখা করব।' আমি বললাম, 'আসুন না, আমারও ভালো লাগবে।' হেসে যোগ করলাম,'আমাদের সম্পর্কটা তো ভাতের সম্পর্ক, তাই না ?'

পুজো শেষ। ছুটির অবসরে লেখাটা শেষ করছি। মন্টুর ফোন এল, 'শুভ বিজয়া দাদা।'

বিদেশ যাত্রা

বেশ কিছু বছর আগের একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল। কলকাতা বিমানবন্দরের নূতন অট্টালিকা তখনও তৈরী হয়নি। পুরনো টার্মিনালে সকালবেলা পৌঁছলাম। দুর্গাপূজা আর দীপাবলির মাঝামাঝি কোন একটা দিনে আমার চন্ডীগড় যাবার ছিল। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে দিল্লি গিয়ে আবার অন্য একটা ফ্লাইট ধরতে হবে।

একতলার চেক ইন কাউন্টারে লাইনে দাঁড়ালাম। অপেক্ষা করতে করতে দেখলাম আমার ঠিক সামনের ভদ্রলোক -ভদ্রমহিলার বেশ সময় লাগছে। দুজনেরই বয়স হয়েছে, হাতে কাগজের গোছা এবং নীল রঙের ভারতীয় পাসপোর্ট। বুঝলাম বিদেশে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক শান্তই আছেন কিন্তু ভদ্রমহিলা বেশ উৎকণ্ঠিত, কাগজপত্র সামলাতে পারছেন না। মনে হলো দিল্লীতে গিয়ে উড়োজাহাজ বদলটা নিয়েই দুশ্চিন্তাটা বেশি। শুনেছেন নূতন টার্মিনাল নাকি খুবই বড়, হয়ত অনেকটা হাঁটতে হবে। ইমিগ্রেশন বিষয়টার সাথে কোন পরিচয় নেই; ইংরেজি বা হিন্দীতে প্রশ্ন করলেও কিছু উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মী ভদ্রলোক যথাসাধ্য বুঝিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তবুও যেন চিন্তা কমে না। স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে আমিই বললাম, চলুন দিল্লীতে আমি সাহায্য করে দেব, আমার হাতে সময় আছে। এখন বোর্ডিং পাসটা নিয়ে নিন।"

- সাহায্য করবে বাবা? বাঁচাইলেগো। হয়ত ছেলের বয়সী বলে ভরসা করলেন। আমিও বোর্ডিং পাস হাতে ওনাদেরকে নিয়ে এগোতে থাকলাম। উপরে উঠে একটা পছন্দমত বসার জায়গা দেখে তিনজনে পাশাপাশি বসা গেল।

- বসুন, আমি একটু বইয়ের দোকান থেকে আসি ।

- কোথায় যাবে বাবা? পালিয়ে যেওনা যেন।

- এখুনি আসছি, পালাব কোথায়?

- যে কটা বাংলা খবরের কাগজ পেলাম সবকটা ওনাদের জন্য কিনলাম।

– নিন, পথে যেতে যেতে মাঝে মাঝে পড়বেন আর বিদেশে গিয়ে ছেলেকে পড়তে দেবেন, ওর ভালো লাগবে।

– খুব ভালো কাজ করলে বাবা, ভদ্রলোক বললেন।

- কোথায় যাবেন?

- ছেলে হাইডেলবার্গে থাকে। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আমাদের নিয়ে যাবে। নাতির অন্নপ্রাশন দেশে করার ইচ্ছ ছিল। ওরা আসতে পারবে না। ছুটি নেই, তাই আমরা যাচ্ছি। এবার মাসিমা মুখ খুললেন, "বিদেশে থাকিস, বিদেশেই থাকনা। যখন আসতে

পারবি তখন জমির চালের ভাত তোর ব্যাটার মুখে খাইয়ে দেব। বুড়াবুড়িকে টানা কেন?"

ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি চাল কিছুটা নাওনি? নেবে বলেছিলে তো।' অভিমান ভরা উত্তর এলো, 'হ্যাঁ, আছে সুটকেসে এক কৌটা।'

উনি বলে চলেন, "দেখতো, এসব জুতা পরা যায়? এগুলা নাকি ঐদেশে গেলে পরতে হবে। মাসিমা সাদা স্পোর্টস্-শু পা থেকে খুলে সাময়িক স্বস্তি পান। ভিতরে সাদা মোজা আলতার দাগে লাল। মনে মনে ভাবলাম বিদেশে সিকিউরিটি চেকের সময় বিপদে না পড়েন এরা তো আর আলতা চেনে না। শুভ কাজে যাচ্ছেন আলতা ছাড়া আর সাজ সম্পূর্ন হয়? বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলেও আলতার দাগ।

'এই কাগজ লাগবে, ওই পোশাক লাগবে একেবারে পাগল করে দিল।'

- এত ভাববেন না, মাসিমা, অনেক ছেলেমেয়ের মায়েরাই আপনার মতন বিদেশে যান। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আর বলো নি, আমি কলকাতায় গিয়ে দুদিন থাকতে পারিনা বড়ছেলের বাড়িতে, এ তো আবার অন্য দেশ।

- আপনার ছেলে কত গুনী, তাই না? আপনার কত আনন্দ।

- কি জানি বাবা? যতদিন কেশিয়াড়ির স্কুলে পড়েছে ততদিন আমার কাছে ছিল। বদমায়েশি করলেও পড়াশুনাটা মন দিয়ে করতো। তারপর কোথায় কি সব পড়েছে অত বাবা সব মনে থাকে না।

- আপনাদের কেশিয়াড়িতে বাড়ি? ওখানে আমি অনেক গেছি।

- তাই? কাকে চিন বল?

- ওই বাঘাস্তির মনোজ বাবু।

- গবুদা? আমাদের খুব চেনা গো, আমার ভাসুরের বন্ধু।

- তাহলে আপনি তো চেনা মানুষ।

- আচ্ছা সত্যি বলতো, ওদেশে নাকি শীতকালে প্যান্ট পরতে হবে - তাই?

বাড়ির মধ্যে তো হিটার চলে; ঠান্ডা লাগে না। বাইরে যখন বরফ পড়ে তখন শাড়ির বদলে প্যান্ট পরলে হাঁটতে সুবিধা হয়।

ধুর, কে বাইরে যাবে?

- কেন যাবেন না? নূতন দেশ দেখবেন।

- কি দেখব বল? কেন যে তিনমাস থাকার ব্যবস্থা করলো কে জানে?

- একবার যান, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

এবার মুখ ফিরালেন স্বামীর দিকে। শ্রী সুকুমার দলপতি তখন মন দিয়ে সংবাদপত্র পড়ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ গো, দামোদোর কে সব বুঝিয়ে এসেছ তো?

কালিপুজোর আগে উঠোন গোয়াল ভালো করে পরিষ্কার করে নিকাবে তো? প্রদীপগুলা সব কোথায় গুছিয়ে রাখা আছে কমলা জানে তো? বাঁদনাটা ঠিকঠাক মিটলে হয় এবার।

- আবার ঘরের চিন্তা? বাড়ির সবই তো পুরাতন লোক, তিনটা মাস সামলে নিতে পারবে না? গৌরদাসীতো আছে।

কে জানে পারবে কিনা? সারাদিন ওদের পিছনে লেগে থাকার কাজটাতো আমাকেই করতে হয়। গরুটারও বাচ্চা হবে।

- ছেলের কাছে যাচ্ছ, নাতিটাকে প্রথম দেখবে, আনন্দ কর তো। আমার চাইতে তোমাকে দেখলে তোমার ছানা বেশি খুশি হবে। ছোটটার পিছনে তুমি কি পরিমান চেঁচাতে মনে পড়ে?

- চেঁচাতাম তো কী হয়েছে? মায়েরা ওরকম করেই থাকে। ওরা ওদের মতন ভাল থাক। যাওয়া তো কদিনের জন্য, তারপর? ফিরে এসে গাছপালাগুলোকে আস্ত দেখলে হয়।

এবার সুকুমার বাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা বাঁদনা কী?'

- বাঁদনা একটা পরব, দীপাবলির পরেই হবে। তোমার দেশ কোথায়?

- চব্বিশ পরগনা।

ওই জন্য জান না। ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া গেলেই দেখতে পাবে। ওই দিন গরুগুলোকে সিঁদুর, ধানের শীষ আর মালা পরিয়ে সাজানো হয়। লাঙল, মই, জোয়াল এইসব চাষের যন্ত্রপাতি ধুয়ে মুছে সিঁদুর লাগিয়ে পূজা করা হয়। ছেলে ছোকরারা বাজনা বাজিয়ে আনন্দ করে, গরুকে খেলিয়ে মজা পায়। বলতে পারো এটা কৃষির পূজা। একবার আমাদের দেশে এসে দেখে যেও।

কথায় কথায় সময় কেটে গেল। বিমানে চড়ার ঘোষণা হয়ে যেতে আমরা আসন ছেড়ে উঠলাম। প্লেনের ভিতর সিটগুলোও কাছাকাছি পড়ল ওনারা দুজন ডানদিকে, আর আমি গলির বাম দিকে। বললাম, 'ডানদিকে নজর রাখবেন, দূরে হিমালয় দেখতে পাবেন। সাদা পর্বতচূড়া খুব সুন্দর লাগবে।'

আমার বামদিকে এক বৃদ্ধ দম্পতি ছিলেন। বিমানের জন্য অপেক্ষা করার সময় ওরা যে আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন তা জানতাম না। এরা শহুরে দম্পতি - সল্টলেকে থাকেন, সন্তানরা প্রবাসে। এখন দিল্লি যাচ্ছেন। ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পরিচিত এরা?

- না, এখনই পরিচয় হল।

- খুব সহজ-সরল মানুষ দুজনে, তাই না? ভদ্রমহিলার মন পড়ে রয়েছে দেশের ঘরে, বিদেশে যে যাচ্ছেন তার কোন আনন্দ বা উচ্ছাসের চিহ্নমাত্র নেই।

ওনার স্ত্রী বললেন, 'মায়ের অভিমানটা বুঝতে পারলে না? ছোট ছেলের প্রসঙ্গে

একটাও কথা উচ্চারণ করলেন না।

- তা বটে, তবুও গাছপালা, গৃহপালিত জীব, গাঁয়ের মানুষ এসব নিয়ে মাটির কাছাকাছি ভালই আছেন। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল - তাতে এক অব্যক্ত মন লুকিয়ে আছে।

বিমান দিল্লি পৌঁছালো। আমার প্রতিশ্রুত দায়িত্ব আছে। মাথার উপর থেকে দলপতি দম্পতির ট্রলি দুটো আমিই নামালাম। বাক্সের গায়ে বড় বড় করে লেখা সুধারাণী দলপতি আর সুকুমার দলপতি। আস্তে আস্তে হেঁটে এরোব্রীজের শেষে গেটে পৌঁছাতেই একজন বিমানকর্মী জিজ্ঞাসা করলেন, ' Any passenger for Frankfurt ? এই তো মাসিমা, আপনাদের নেবার জন্যে লোক অপেক্ষা করছে। আর চিন্তা নেই। কর্মী ভদ্রমহিলা বোর্ডিংপাস ও পাসপোর্ট মিলিয়ে নিলেন। ওনাকে অনুরোধ করলাম যেন এঁদের কোন অসুবিধা না হয়। উনি আশ্বস্ত করলেন।

- এবার আসি তাহলে?

বেঁচে থাক বাবা। কেশিয়াড়িতে আমাদের বাড়ি আসবে কিন্তু। একা নয়, বৌমাকে নিয়ে।

গলফ কার্ট এল, ওনারা গিয়ে বসলেন। ধীর গতিতে গাড়িটা এগিয়ে চললো। দেখলাম দলপতিবাবুর ট্রলিব্যাগের চাকার কাছে মাকড়সার জাল লেগে আর তাতে আটকে আছে দুটো ধান। তারাও চলল বিদেশে, যদি কারও চোখে না পড়ে হয়ত বা আবার ফেরত আসবে। ফিরেই আসুক, মেদিনীপুরের ধান জার্মানীতে ফলবে না।

বিনোদিনী

"প্রিয় কেট,

অনেক বছর পর এবার অ্যাকাডেমি মিটিং এ যাব ঠিক করেছি। তোমরাও যদি আসো তাহলে দেখা হতে পারে। এবারের ভেনু লাসভেগাস। ওখানে কোনও দিন আগে যাইনি। শুনেছি ওটা এক অদ্ভুত জায়গা। তোমরা গেলে জানিও।" একটা চিঠি লিখলাম।

কেট আর ফিলিপ দুজনে একটা চ্যারিটির হয়ে কাজ করে, ওদের অফিস নিউইয়র্কে। আমাদের চোখের চিকিৎসার কাজে ওদের সংস্থা অনেক সাহায্য করেছিল। সখ্যতা বেশি হয় যখন আমাদের দেশে ওরা আমাদের কাজকর্মের তথ্যচিত্র তুলতে এসেছিল। দুটি শিশুর দৃষ্টি ফিরে আসা নিয়ে একটা ছোট ফিল্ম খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এই সূত্রে বহু মানুষের সাথে চাক্ষুস না হলেও চিঠির মাধ্যমে পরিচিত হচ্ছিলাম।

খুব তাড়াতাড়ি কেট চিঠির উত্তর দিল, "ডক্টর, একটা অতিরিক্ত দিন কি আমাদের জন্য দিতে পার? তাহলে ভারত থেকে নিউইয়র্ক একটা দিন যাত্রাবিরতি করে পরের দিন লাস ভেগাস চলে যেতে। আমরা তোমার সাথে একটা সন্ধ্যা আড্ডা দিতে চাই।"

হাতে সময় থাকলে আতিথেয়তা গ্রহণ না করার কোন কারণই থাকতে পারে না। তাই কেটের প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হলাম। টিকিটও সেভাবেই কাটা হল। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই চিঠি এল আমার নিউইয়র্কের স্বল্প অবস্থানের জন্য কী কী ব্যবস্থা হয়েছে তার বিষদ বিবরণ দিয়ে। ওদের অফিস ম্যানহাটনে, তাই টাইম স্কোয়ারের কাছেই হাভার্ড ক্লাবে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানকার ডাইনিং হলেই সন্ধ্যাবেলায় কয়েকজন অতিথিকে নিয়ে একটা ডিনার আয়োজিত হয়েছে। চিঠির পাদটীকায় লেখা থাকল: ড্রেস কোড ফর্মাল স্যুট, টাই আর পায়ে ফর্মাল জুতো।

একটু ভাবনা হল বৈকি। স্যুট একটা আছে, বড় একটা পরা হয় না। ফর্মাল জুতো কাকে বলে? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? শুনলে হাসবে। আমার স্মৃতি বয়ে নিয়ে গেল আমার মেডিকেল কলেজের ছাত্রজীবনে। তখনও সেখানে বেশ কিছু বিলেত ফেরত অধ্যাপক পড়াতেন। তাদের মধ্যে প্রফেসর কাপাস সবচেয়ে বিলিতি আদব কায়দায় সচেতন ছিলেন। অ্যাম্বাসাডারের যুগে উনি একটা ব্যতিক্রমী লম্বা অস্টিন গাড়ি চালিয়ে কলেজে আসতেন, তার সাথে ছিল ফিটফাট স্যুট-বুট এবং পাক্কা সাহেবী সময় জ্ঞান। মনে করে দেখিতো স্যার কোন জুতো পরতেন- হ্যাঁ ফিতে বাঁধতে তো দেখেছি। তাহলে ফিতে বাঁধা জুতোই ফর্মাল সু। আমার হাসপাতালে অসংখ্যবার জুতো খুলতে হয়, ফিতে বাঁধার ঝামেলা। তাই সহজে পা গলে যায় এমন পাদুকাই আমার আছে। আমেরিকানরা

তো খুব ক্যাসুয়াল বলে জানি, ব্রিটিশরা বরং আদবকায়দায় সচেতন। কে জানে হাভার্ডের কী নিয়ম? বাবা সাবধান হওয়া ভাল। উপায় - বাটার কিছু বিক্রিবাটা হবে আর কী?

অক্টোবরের কোন এক সকালে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে দিল্লী থেকে জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে নামলাম। আমার অপেক্ষায় প্লাকার্ড হাতে একজন ছিলেন তাই বিশেষ খুঁজতে হলো না। বিশাল বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে কিছুটা ফাঁকা এলাকা ছাড়ানোর পরই আকাশচুম্বী অট্টালিকার দেশে পৌঁছে গেলাম। একে ইমারতের অরণ্য বলাই ভাল। সকালে রাস্তায় যান নেই তাই সহজেই ম্যানহাটন পৌঁছে গেলাম। হাভার্ড ক্লাব টা বেশ রুচিসম্মত আবাস, হোটেল থেকে একদম আলাদা। মূল বিশেষত্বটা আসবাবপত্রে। প্রাচীন কাঠের চেয়ার, টেবিল, আয়না সর্বত্র। দেওয়ালের ছবিগুলোর বেশিরভাগই সাদাকালোয় হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান দৃশ্যাবলী। রিসেপশন থেকে হাতে ধরিয়ে দিলো বিভিন্ন ঘরের ড্রেস-কোডের তালিকা। ডাইনিং হলটাই সবচেয়ে কঠোর দেখলাম। শুধুমাত্র উইকেন্ডে জিনস অনুমোদিত, তা আবার ছেঁড়া হলে চলবে না।

দুপুরে একটু হাঁটতে বেরলাম–গন্তব্য কেটের অফিস। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, ছাতা - সাথে নেই, তাই বাড়ির গা ঘেষে যতটা পারলাম মাথা বাঁচিয়ে 5th street এ পৌঁছে গেলাম । বিরাট বাড়ি - দরজায় নাম লিখিয়ে তবে লিফটে সোজা ৩৪ তলায় যেতে হল। কেট কিছু খাবার নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

- এসো, পশ্চিমের জানালাটার কাছেই বসি। ঐ বাড়িটা হল এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। খেয়ে নাও, তারপর দেখাব ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার কোথায় ছিল। একথা সেকথা চলতে থাকে। আমার মনের কৌতুহল সন্ধ্যাবেলার খাবারের আসর নিয়ে, মৃদু শঙ্কা- ড্রেস কোড ঠিক থাকবে তো? তারপর কারা কারা আসবে একটু ধারনা থাকলে

মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া যায়।

- সন্ধ্যার মুখ্য অতিথি কে, কেট?

- কেন, তুমি

- মজা করো না। এমনিতে লাস ভেগাস নিউইয়র্ক হয়েই যেতে হতো, তুমি বললে বলে একদিন যাত্রাবিরতি করলাম।

মজা মোটেই করছি না, মিসেস লিজ জনসনের অনেকদিন তোমার সাথে দেখা করার ইচ্ছা। যখন ওনাকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম তখন সময় হয়ে ওঠে নি।

-আমার সঙ্গে? বিশেষ কি কারণ? Documentary দেখার পর তোমার কাজকর্ম নিয়ে ওনার আগ্রহ হয়েছে।

–মিসেস জনসন ভদ্রমহিলা কে?

- উনি আমাদের খুব বড় একজন ডোনার। এত পরিমান ব্যক্তিগত দান খুবই বিরল। এখন বয়স ছিয়াত্তর কিন্তু যথেষ্ট কর্মঠ এখনও।

- তুমি আমার চিন্তা বাড়িয়ে দিলে যে, এত বড়োলোক !

- কোন চিন্তা নেই । ভদ্রমহিলা আচার আচরণে বুঝতেই দেন না উনি এত ধনী।

বৃষ্টি পড়ছে দেখে কেট আমাকে নিজেই ওর গাড়িতে হাভার্ড ক্লাবে ছেড়ে দিয়ে গেল। টাইম স্কোয়ার দেখিয়ে বলল, "রাতে বৃষ্টি না থাকলে একবার ঘুরে যেও। বিচিত্র লোকজন যেমন খুশি করে বেড়ায় এই স্কোয়ারে।" ডিনারের সময় নির্ধারিত ছিল সন্ধ্যা সাতটায়। ছটার পর থেকেই সাজগোজে মন দিলাম। টাই, কোট যেন ঠিক থাকে। নূতন জুতোর ফিতেটা যেন সমান ভাবে বাঁধা হয়। আয়নাতে বারকতক নিজেকে দেখে পৌনে সাতটাতেই ডাইনিং হলের নির্ধারিত টেবিলে পৌঁছে গেলাম। কেট আর ফিলিপ আয়োজক, ওরা আগেই এসে গেছিল। আরও দুজন ভদ্রমহিলা এলেন।

ঠিক সাতটায় মিসেস লিজ জনসনের প্রবেশ। ভেজা ছাতাটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে গটগট করে টেবিলে পৌঁছে গেলেন। ছিপছিপে চেহারা, একগাল হাসি নিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "I can easily identify you, doctor. Welcome to New York." সবার সাথে করমর্দন করে আসন গ্রহন করলেন। চোখ দুটো কি অপরূপ দেখতে, বেশ রাজকীয়তা আছে দৃষ্টির মধ্যে। এদেশে লোকে ওকে এক কথায় দুগ্‌গা প্রতিমা বলতো। নিশ্চয় কোন ধনী পরিবারের মেয়ে হবেন। ওনার নির্ধারিত চেয়ার আমার পাশেই। প্রাথমিক পরিচয় পর্বের পর ঠিক করা হল কী কী খাওয়া হবে। ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে যেতেই শুরু হলো আড্ডা। কী আর কথা হবে? আমার দেশ আর তোমার দেশ, আমরা এই খাই আর তোমরা ওই খাও এইসব আর কী। যারা ভারত ঘুরে গেছে তারা আমাদের খাবারের তারিফ করে - এটা অপ্রত্যাশিত কিছুই নয়। ভারতীয় খাদ্যের জনপ্রিয়তা সর্বত্র। মনে হল লিজ একান্তভাবে আমার সাথে কথা বলতে চায়।

- ডাক্তার তোমার জন্ম কোথায়?

- কতদূর চিনবে জানি না, সহজে বলতে পারি বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে একটা গ্রামে।

- ওখানেই বড়ো হয়েছ?

- কলেজে যাবার আগে পর্যন্ত তো গ্রামে থেকেছি। তারপর বিভিন্ন শহরে। এভাবেই আমার পরিবার, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সবের পরিচয় লিজ পেয়ে যায়। আমাকে প্রথম আলাপেই কেউ এত বিশদে কখনও ব্যক্তিগত তথ্য জিজ্ঞাসা করেছে বলে মনে পড়ে না। হঠাৎই একটা অন্যরকম প্রশ্ন আমাকে করে বসলেন, এবারে নাম ধরে।

– অসীম, তুমি কখন ও মানুষকে কষ্ট পেতে দেখেছ?

– সে তো বটেই, সবার আশেপাশে এরকম কত ঘটনাই তো ঘটে। আমরা ডাক্তাররা তো আরো বেশি দেখেছি।

-হ্যাঁ, ঘটনা ঘটে, কিন্তু সবগুলো তো আর মানুষের মনে পরিবর্তন ঘটায় না, জীবনের স্রোতে সব কোথায় মিলিয়ে যায়।

- তুমি এমনটা জানতে চাইছো, কারণ?

- মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য মানুষের দুঃখই বোধহয় বড় অনুঘটক, তাই না?

- ঠিকই, সেরকম যদি বল তাহলে বলব খুব ছোটো বেলায় দেখা বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ একটা বড় ঘটনা। ছিন্নমূল শরনার্থীদের কষ্ট আমার মনে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। আমার শুধু মনে হতে থাকল প্রশ্নগুলোর খুব গভীরতা আছে, কিন্তু কেন এমন জিজ্ঞাসা, তাও আবার নিছক এক সৌজন্যের ডিনারে? খাবার টেবিলে খাদ্য, পানীয় কি এল কিছুই আর নজরে আসছিলনা, মনেও নেই কী খেয়েছিলাম। আশেপাশে কোলাহল না থাকলেও মানুষ অনেক - তাদের সবার পোষাক কী ছিল তাও চোখে পড়েনি। এদিকে কৌতুহল বাড়তে থাকলেও সাহস করে লিজের জীবন নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হচ্ছে না। গ্রামে বেড়ে ওঠা এক মধ্যবিত্ত বাঙালি ছেলে এই অপ্রত্যাশিত পরিবেশে এক ধনী বিদেশীনিকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে ইতস্তত করবে- সেটাই স্বাভাবিক।

নিজেই ভদ্রমহিলা এবার নিজের প্রসঙ্গ তুললেন। আমি কম বয়সে একজন মডেল এবং নৃত্য শিল্পী ছিলাম। এখন বয়স বেড়েছে, তাই দেশের বিভিন্ন শহরে আমার নাচের স্কুল চালাই। আমার জীবনটা জান, প্রাচুর্যে ভরা, তবুও কোথাও একটা বড় শুন্যতা আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। আমি সতেরো বছর বয়সেই মা হয়ে যাই এবং আঠারো বছরে প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। বয়স কম, দেখতে সুন্দরী – বুঝতেই পার আমার চতুর্দিকে পুরুষের বিচরণ কেমন হতে পারে। এরপর আমার আরো তিনবার বিয়ে হয়েছে। এখন কিন্তু আমি একা, নির্ভেজাল একাকী।

- কেন একা? অতি সাবধানে জিজ্ঞাসা করলাম।

– প্রত্যেক স্বামীর সাথেই সন্তান আছে, তবুও একা।

– তাদের সাথে যোগাযোগ নেই?

– আমিই রাখিনা সম্পর্ক। It's too complex. ছোট বেলায় আমার বাচ্চারা যখন maze (গোলকধাঁধা) নিয়ে খেলত তখন আমি বলতাম, একদিন তোমাদের মাকেও এইরকম ভুলভুলাইয়ার মধ্যে খুঁজতে হবে, কিন্তু খুঁজে পাবেই না। আমি কথা রেখেছি। ওদের জানতেই দিই না আমি কোথায়। এই শহরেই থাকেন?

- একেবারে শহরে নয়, একটু বাইরের দিকে। কোলাহল ভালো লাগে না। আগে দূরে একটা ফার্মহাউসে থাকতাম। এখন চিকিৎসার প্রয়োজনে শহরের কাছে চলে

এসেছি।

- শুনলাম, তুমি আমাদের দেশে গিয়েছিলে?

- হ্যাঁ গেছি তো, খুব উপভোগ করেছি।

লিজ মাথাটা ঘুরিয়ে দেখায় একটা সাধারণ ক্লিপ চুলে বাঁধা। "এটা বিহারের একটা ছোট মেয়ে আমাকে দিয়েছিল। ওর মাথার ক্লিপটার তারিফ করতেই হাসি মুখে চুল থেকে খুলে আমাকে দিয়ে দিল । কত আদর বলতো ! তোমাকে দেখাব বলে আজ এই স্মৃতিচিহ্নটা মাথায় দিয়ে এসেছি।"

কোন কোন বিখ্যাত জায়গা দেখলে? তাজমহল, বোধগয়া?

- I am not interested in visiting Monuments, I wanted to meet people. আমার চতুর্থ এবং শেষ স্বামী খুব ভালো মানুষ ছিলেন। সত্যিকারের কোন পুরুষ যদি আমাকে সসম্মানে ভালোবেসে থাকে তাহলে সেই মানুষটা একমাত্র ফ্রেড। মৃত্যুর আগে আমাকে বলে গিয়েছিল ওর গচ্ছিত সম্পদ যেন মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয়। আমি সেই কথা রাখার জন্য আমার উপার্জন থেকেও দান করি। এর সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যেখানে এই অর্থ কাজে লাগে সেখানে বেড়াতে যাই। কোন সম্মানের প্রত্যাশায় নয়, সেখানকার সাধারণ মানুষগুলোর মুখের হাসি আমার জীবনের শুন্যতা পূর্ণ করে দেয়। এভাবেই ফ্রেড আমাকে জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার দিয়ে গেছে।

বঙ্গসন্তানের মন চলে যায় কলকাতার ইতিহাসে, যেখানে অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসী উইল করে যায় নিজের তিন খানা বাড়ির দুইখানা বড়বাজার হাসপাতালের জন্য। তারাসুন্দরী অবসর নেওয়ার পরও রঙ্গমঞ্চে ফেরত আসেন ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যার্থে বিনা পারিশ্রমিকে অভিনয় করতে। মিনার্ভা থিয়েটারে ব্রাত্য বিনোদিনীরা ঋন ভারাক্রান্ত কবি রজনীকান্তের চিকিৎসার্থে বেনিফিট শো করে। এ ছিল সেই যুগ যখন কলকাতার ভদ্রলোকেরা থিয়েটারকে অস্পৃশ্য মনে করতেন বারাঙ্গনারা অভিনয় করেন বলে।

কিছু সময় কথা বন্ধ থাকল। খাওয়া শেষ করলাম, আবার লিজ বলে, "ডাক্তার, তোমার সাথে দেখা করার জন্য আমি অনেকদিন অপেক্ষা করেছিলাম। আমার অনুরোধ রক্ষা করে নিউইয়র্কে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"

-ধন্যবাদ তোমাকেও। বিশেষ কৃতজ্ঞতা কেট আর ফিলিপকে সকল আয়োজনের জন্য।

এবার ওঠার পালা। আমি সদর গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম যেখানে লিজের গাড়ি পার্ক করা আছে। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে, টাইম স্কোয়ারের নান রঙের আলোয় বাড়িগুলো ঝিকমিক করছে। লিজকে ছেড়ে দিয়ে একবার ঘুরতে যাব তাহলে। বিদায়কালে লিজ হাতটা বাড়িয়ে দেয় করমর্দনের জন্য; ধরে থাকে আবেগভরে

দীর্ঘসময়। ওর মুখে থেকে শুনতে পাই, "Doctor, thank you so much for allowing me to touch the hand that has changed so many lives."

একটা অদ্ভূত অনুভূতি কেমন আচ্ছন্ন করে ফেললো। গাড়িটা মিলিয়ে গেল আলো আর মানুষের সমুদ্রে। টাইম স্কোয়ারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ঠিক করলাম - থাক, আজ আর কোথাও যাব না।

বুনো

"হাতির বাচ্চাটা আমাদের বাড়িতেই হইসিল। তাই কদিন আগে ওর এক বছরের জন্মদিন আমাদের বাড়িতেই হইল। আপনাকে ছবি দেখাব, ম্যাডাম।" ধূপঝোড়ার রিসর্টে দুপুরে খাবার বেড়ে দিতে দিতে অজয় বলতে থাকে। আজই সকালে কলকাতা থেকে আমরা উত্তরবঙ্গে পৌঁছেছি। আসার কথা ছিল আগামীকাল। ঘটনাচক্রে একদিন আগেই চলে আসতে বাধ্য হলাম। বাধ্যই যখন হলাম তখন দিনটার সদ্ব্যবহার তো করতেই হয়। চিন্ময়ের শরণাপন্ন হতেই এককথায় বলল,"পাহাড়ে তো কদিন যাবিই, একদিন না হয় ডুয়ার্সে কাটিয়ে যা।" এখন দিনটা মনে হচ্ছে উপরি পাওনা।

ধূপঝোড়াতে এসে থেকেই প্রকৃতির কোমলতা প্রতি পদে অনুভব করতে পারছি। সামনেই মূর্তি নদী, ওপারে গরু চড়ছে, আবার অনায়াসে নদী এপার-ওপার করছে, আর একটু দূরে তাকালে দিগন্ত বিস্তৃত গোরুমারার জঙ্গল। ডুয়ার্সের নায়ক তো হাতি, তাই স্থানীয় লোকের সাথে এক কথা দুই কথা বলতে গেলে হাতির প্রসঙ্গ উঠে আসবেই। চাষিদের বিস্তর আতঙ্ক ঘিরে থাকে গজবাহিনীকে ঘিরে। রাত জেগে ফসল রক্ষা করা তাদের যেন জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। কিন্তু অজয়ের মুখে হাতিকে ভালবাসার গল্প আমাদের খিদের পেটে গরম ভাত দিয়ে মুরগির ঝোল খাবার থেকেও বেশি আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল।

- আমাদের গ্রামে হাতি কোন ক্ষতি করে না। সবাই তাদের আদর করে খাইতে দেয়। ওরা একটাও গাছ ভাঙ্গে না।

- কি খেতে দাও?

- ভাত আর ডাল সিদ্ধ কলা পাতায় সাজাইয়া দিতে লাগে, গুড়ও খায়।

- তুমি হাতি সম্পর্কে এত কিছু জানলে কী করে ?

- আমার বাবা তো মাহুত। ছোট থেকেই জঙ্গলে থাকার অভ্যাস আছে বাবার সঙ্গে। কত হাতিরে স্নান করাইসি, পিঠে চড়সি। রাত্রে যখন ডিনারে আসবেন তখন জন্ম দিনের ভিডিও দেখাব।

কি সাবলীল বন্ধুত্বের গল্প। ছবি দেখার অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু ছেলেটা আমার মনকে আর এক অরণ্যে টেনে নিয়ে গেল।

মাস খানেক আগেই কটা দিন মাদারীহাটে একটা কাজের জন্য থাকতে হয়েছিল। হঠাৎ পরিচয় ঘটে আমার এক বন্ধুর ছাত্রীর সাথে। শরণ্যা এবং শুভঙ্কর দুজনে এসে আমাকে আমন্ত্রন জানিয়ে যায় ওদের সরকারী নিবাসে অতিথি হবার জন্য। যুগলের আন্তরিক অনুরোধ ফেলতে পারিনি, তার উপর জঙ্গলের মধ্যে রেঞ্জার সাহেবের বাংলো

দেখার সুযোগ ছাড়ে কে?

পরদিন কালচিনিতে কাজ সেরে বিকেলে মাদারীহাট পৌঁছাতেই শুভঙ্কর ওর গাড়িতে আমাকে নিতে এল।

- তাড়া নেই তো আপনার ?

- না না। রাতে ফেরার অসুবিধা না থাকলেই হল। ফিরতেই হবে কারণ পরদিন বেশ সকালেই আবার যেতে হবে।

- সে যত রাতই হোক, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।

বনকর্তার হাতেই যখন সব তখন বনে আর চিন্তা কি?

গাড়ি এগোতে থাকে বড় রাস্তা ছেড়ে হলং এর দিকে। দু চারটে ময়ূরকে ঘুরতে দেখা যায় এদিক ওদিক। যাবার পথের ডান দিকটা পুরোটাই টানা ধাতব তার লাগানো খুঁটির সাথে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওটা হাতিকে বনের বাইরে যাওয়া ঠেকানোর জন্য। মৃদু বিদ্যুৎ চলাচল করে তাতে, হলকা ঝটকায় যাতে ওরা পিছিয়ে যায়।

হাতিকে নিয়ে নানান কথা চলতে থাকে। সাধারণ ভাবে গজকুল পূজিত প্রাণী হলেও অরণ্যসীমাবর্তী মানুষের কাছে এরা কখনো কখনো ত্রাসের কারণ হয়ে যায়। মূলতঃ খাদ্যের সন্ধানেই লোকালয়ে প্রবেশ করে এমন ফসল নেই যে তার ক্ষতি করে না। চা গাছটাই এখনো পর্যন্ত ব্যতিক্রম। হাতির প্রিয় খাদ্য বট, অশ্বথ এবং ডুমুর পাতা। বনদপ্তর থেকে তাই শাল সেগুনের মাঝেও এই গাছ গুলো রোপন করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, যদি বনেই খাবার জোটে তাহলে ঐরাবত আর লোকালয়ে যাবে না।

জঙ্গলের মধ্যে বেশ খানিকটা যাবার পর গাড়ি বদল হল। রেঞ্জার সাহেব তার নির্দিষ্ট শকটে সান্ধ্য পরিদর্শনে বেরোবেন। এই রাউন্ডে আমি সঙ্গী হব সেই পরিকল্পনা করাই ছিল। চলতে চলতে যদি কোন অরণ্যচরের দেখা মেলে সেটাই পাওনা। তাদের দর্শন না হলেও গভীর অরন্যে আধা আলো আধা অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানোও তো এক অনন্য অভিজ্ঞতা - সেটাই তো বড় ব্যাপার।

একটা মজবুত গাড়িতে বসলাম। সামনে চালকের আসনের পাশে শুভঙ্কর - ওটাই রেঞ্জার সাহেবের নির্দিষ্ট সিট চতুর্দিকে নজর রাখার জন্য। দ্বিতীয় সারিতে আমি আর অন্য একজন বলিষ্ঠ চেহারার বনকর্মী, জন বড় টর্চ হাতে। গাড়িটার একটা বিশেষত্ব চোখে পড়ল, জানলার কাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই চালকের হাতে।

মূল রাস্তা ছেড়ে আমরা ডানদিকে জঙ্গলে ঢুকলাম। রাস্তা তো নয়, গাছপালার মাঝে ফাঁকা জায়গায় মাটিতে চাকার ছাপ ধরে ধরে চলা। এই পথ ধরেই ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যের দিকে আমরা চলতে লাগলাম। ভাগ্য সহায়, একটু পরেই একটা গন্ডার আর কয়েকটা বাইসনের দেখা মিলল। বর্ষাকাল বলে ঝোপের গাছগুলো অনেক ঘন এবং উঁচু হয়ে গেছে। তাই শিংগুলোই দেখা যাচ্ছে মাত্র। গাড়ি চলতে চলতে

মাঝে মাঝেই গাছের ডাল জানালার ফাঁক দিয়ে গা ঘষে দিয়ে যায়। চালক কাঁচটা তুলে দিলেন। কখনো কখনো কোন গাছের সাথে ঘর্ষণে সুন্দর বুনো গন্ধ আসে যার তুলনা কোন পারফিউমের সাথে মেলে না। গাড়ি বুড়ি-তোর্সার কিনারে একটু দাঁড়াল-যদি কোন বন্য পশু জল খেতে আসে তবে দেখা যেতে পারে। কারও দেখা না হলেও পড়ন্ত সূর্যের আলোয় জায়গাটা বড়ো মায়াবী দেখাচ্ছিল। সূর্যাস্ত হতেই আমরা অন্যদিকে এগিয়ে গেলাম। গাড়ি আর চলতে পারে না। সামনে দুটো দলছুট গরু। সরু রাস্তায় ওদের টপকে যাওয়ার উপায় নেই - ভয়ের চোটে ওরা ঝোপের মধ্যে সরে দাঁড়াতে তবে এগোন গেল। সূর্যের আলো আরও কমে যাচ্ছে, বন্যজন্তু দেখার সম্ভাবনা আর নেই; ভাগ্যক্রমে গাড়ির আলোর সামনে কিছু শ্বাপদ চোখে পড়লেও পড়তে পারে। কিন্তু দূরে ওটা কী দেখা যাচ্ছে? ওটাতো দ্বিপদ একজন মানুষ।

গাড়িটা কাছে যেতেই দেখা গেল একজন মধ্য বয়সী যুবক। প্যান্টটা হাঁটু পর্যন্ত গোটানো, ময়লা নীল জামার বোতাম নাভি পর্যন্ত খোলা, গর্তে জমা জল দিয়ে চোখ মুখ ধুচ্ছে। এই কোর এরিয়া, যেখানে সাধারণের প্রবেশ একেবারে নিষেধ সেখানে এই লোকটা কি করে এল? উদ্দেশ্যই বা কি? রেঞ্জার সাহেব এবার হঠাৎ বদলে গেলেন। এতক্ষণ অরণ্যের নানা বিষয় অনর্গল বর্ননা দিচ্ছিলেন, কোথায় ছোট ছোট আকর্ষনীয় দ্রষ্টব্য আছে তা দেখাচ্ছিলেন। এখন তার বিরাট দায়িত্ব আগন্তুকের পরিচয় উদ্ঘাটন এবং পরবর্তী কর্তব্য পালন।

- এই, তোর নাম কী?

- মহাদেব।

- মহাদেবই বটে। চালচুলো নেই, বাউন্ডুলে।

- বাড়ি কোথায়?

- উদালগুড়ি।

– সাথে কে আছে?

– কেউ নেই।

- এখানে কেন?

কোন উত্তর নেই, শুধু এক শূন্য দৃষ্টি।

- জন, একে গাড়িতে তোলো। জন দুটো থাপ্পার মেরে গাড়িতে এনে পিছনের দরজা খুলে বসালো মহাদেবকে। একেবারে আমার পিঠ ঘেঁষে - মুখোমুখি পাহারায় জন। কে জানে বাবা? পকেটে কোন অস্ত্র নেই তো? বনকর্তা সামনের ওয়াচ টাওয়ারে খবর দেন তৈরী থাকার জন্যে। রেঞ্জ অফিসে বার্তা যায় গাড়ি পাঠানোর জন্য। ওয়াচ টাওয়ারে রক্ষীরা তৈরীই ছিল। রেঞ্জার সাহেবকে স্যালুট দিয়ে যখন ওরা মহাদেবকে গাড়ি থেকে নামালো তখন ভালই অন্ধকার নেমে গেছে। দুদিকে দুজন লাঠিধারী সান্ত্রি

আগন্তুককে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে নিয়ে গেল। এবারে ওরা জেরা করে বোঝার চেষ্টা করবে মানুষটার গভীর জঙ্গলে আসার উদ্দেশ্য কী? শুভঙ্কর বলল, "ওরা ওদের কাজ করুক, চলুন আমরা অন্য কাজ সেরে আসি।" আমরা চললাম বিট আফিসের উদ্দেশ্যে। এবারে গাড়ি থেকে নেমে বুড়ি-তোর্সা নদী পেরোতে হবে। বনকর্মীরা টর্চ নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। সরু দোলনা সেতুর কাঠের পাটাতন কয়েক জায়গায় ভাঙা, তাই ওরা বারবার আলো দেখিয়ে সাবধান করতে থাকে যেন অসাবধানে ফাঁকে পা ঢুকে না যায়। সেদিন কোন তিথি ছিল জানি না - বোধ হয় পূর্ণিমা আর অমাবস্যার মাঝামাঝি। আধা চাঁদের লাজুক আলো বুড়ি তোর্সার বুকে এসে পড়ছে আর তার সাথে কুলকুল আওয়াজের অভিসার। পা বাঁচাতে গিয়ে এই অনবদ্য পরিবেশ আর পুরোপুরি উপভোগ করা হল না।

বিট অফিসে ভালোই অভ্যর্থনা জুটল। ওই গহন অরণ্যে চা - সিঙ্গারা দিয়ে আপ্যায়ন আমার কল্পনার অতীত ছিল। রেঞ্জার সাহেব সব খোঁজ খবর নিলেন জঙ্গলে বর্ষার জল কোথায় কত - বেড়েছে? পাশের গ্রামে কোন পশুর উৎপাত হয়েছে কিনা ইত্যাদি। উপস্থিত বনকর্মীদের সাথে কথা সেরে আমরা আবার ওয়াচ টাওয়ারে ফেরত এলাম।

শুভঙ্কর উপরে উঠে গেল। আমি একা রইলাম গাড়িতে। আর কিছু রক্ষী নিয়ে অন্য একটা গাড়িও ততক্ষণে চলে এসেছে। আমার গাড়ির কাঁচ প্রায় পুরোটা তুলে দেওয়া নিরাপত্তার কারণেই। অন্ধকারে একা বসে নির্জনতা উপভোগ করতে ভালই লাগছিল, তবে দীর্ঘ সময়ের জন্য নয়। ক্রমশ কাঁচগুলো বাষ্প জমে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল রুমাল দিয়ে মুছে মুছে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করছিলাম। বেশ খানিক সময় পর শুভঙ্কর নেমে এসে বলল, "আপনাকে দুজন কর্মী বাসায় নিয়ে যাক, আমার একটু সময় লাগবে। ডিনারের জন্য অপেক্ষা করবেন না, আমার কখন ফেরা হবে জানি না।" পরিস্থিতির প্রয়োজনে আমাকে সেটা মানতেই হল।

জনের পরিবর্তে এখন অন্য এক বনকর্মী আমার সঙ্গী নাম চিন্টু। ও এতক্ষণ জেরার সময় টাওয়ারে ছিল। ড্রাইভার এবং চিনটুর কথোপকথন চলতে থাকে।

- ছেলেটাকে কী মনে হয় তোর?

- বোঝা মুশকিল। পাগলের ভান করে। খুব সুবিধার না। গার্ড কতগুলো ভান্ডার মাইর যা দিসে না। তবুও পরিচয় বলে না। কখনো কয় লগে(সাথে) দুই তিনজন আসে (আছে), কখনো কয় নাই।

- সাথে লোক থাকলে তো চোরা শিকারিই মনে হয়। গন্ডার মারতে আইসে।

- চেহারাটা প্যাংলা দেখাইলে কি হইব, ভালই মাইর সইহ্য করতে পারে। ডান্ডা খাবার অভ্যাস আছে। স্যার যেন অত সহজে ওরে না ছাড়ে, ওনার আবার দয়া মায়া

বেশি।

- না, না, সার ভাল মন্দ ভালই বোঝে। বয়স কম তাই খুব কঠোর হইতে পারে না।

- মানুষ কে যে কেমন হয় ? ভগবান জানে। নেশাখোরও হইতে পারে।

পুরো যাত্রা পথেই আমি নীরব শ্রোতা, শুধু চিন্তা হতে থাকল মহাদেবকে নিয়ে। যদি সত্যিকারের আপরাধী না হয় তাহলে অকারণ যন্ত্রনা পাবে।

রেঞ্জার সাহেবের বাংলোয় পৌছালাম। কাঠের উঁচু একতলা বাড়ি। শরণ্যা সাদরে ভিতরে নিয়ে গেল।

- স্যার, কফি না চা?

- চা - দুধ ছাড়া, চিনি চলবে। আর কিছু দিওনা; একেবারে রাতের খাবার খাব।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নানান কথা চলতে থাকল। আড্ডা দিলেও আমার মন পড়ে আছে ফেলে আসা ওয়াচ টাওয়ারে, সেখানে কি না ঘটছে। অত রোগা ছেলেটা কত মার খাবে কে জানে?

- স্যার, আপনার খাবার রেডি করি? নটা বেজে গেল। সারাদিন তো পরিশ্রম গেছে।

- না না, শুভঙ্কর আসুক, একসাথে খাব।

- অনেক দেরীও হতে পারে, আপনার ধারণা নেই। এইরকম ঘটনা ঘটলে অনেক রকম নিয়ম কানুন পালন করতে হয়। কখনো থানায় পাঠাতে হয়, কখনো হাসপাতালে পাঠাতে হয়, তারপর ঘরে ফেরা - আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

তবুও দেখা যাক না আরও কিছু সময়। আমার রাত করে খাবার অভ্যাস আছে।

চোখে ক্লান্তি নেমে আসছে, তবুও নিশ্চিন্ত না হয়ে খেতে বসতে মন চাইছে না। বেশি অপেক্ষা করতে হল না, শুভঙ্করের গাড়িটা এসে থামল।

- কি হল সাহেব ?

- না, ওকে ছেড়েই দিলাম। আমিও হালকা হলাম।

- লোকটা কে ছিল তাহলে?

- ওটা মানসিক ভারসাম্যহীন, পথ ভুল করে ঢুকে পড়েছে। এরকম মাঝে মধ্যে হয়।

- চোরা শিকারি নয় কেন?

- ওদের কাছে কিছু না কিছু অস্ত্র থাকে আত্মরক্ষার জন্য। এর পকেট খুঁজে কিছুই পাওয়া যায় নি, মোবাইল ফোনও নয়। চোরেরা দলে থাকে। অন্য ওয়াচ টাওয়ার থেকেও আর কারও কোন মুভমেন্ট দেখা যায়নি।

- কোথায় ছাড়া হল ?

- পার্কের গেটের বাইরে বড় রাস্তায়।

এবার নিশ্চিন্তে বসে ডিনার সারা হল। অতি ভোজন যে হল তা বলাই বাহুল্য।

খাওয়া শেষে লোকালয়ে ফেরা, আধঘণ্টা বন পথে গাড়িতে যেতে হবে। গহন অরণ্যে গভীর রাতে ভ্রমন বেশ রোমাঞ্চকর। গাড়িটা ইচ্ছা করেই একটু দীর্ঘতর পথ ধরল কিছু চতুষ্পদ দর্শনের আশায়। সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে একটু ধীরে চালানো হল, বড় টর্চ এদিক ওদিক আলো ফেলল - না কিছুই দেখা গেল না। শরণ্যা-শুভঙ্করের ইচ্ছা ষোল আনা পূর্ণ হতো আমি কিছু দেখতে পেলে। আমার কোন আক্ষেপ নেই - যতটুকু নতুন অভিজ্ঞতা না চাইতেই পেলাম তা অমূল্য বললেও কম বলা হবে। যাত্রা পথের তখন প্রায় শেষ অংশে পৌঁছে গেছি; দূরে মনে হল এক ঝাঁক জোনাকি বা দিক থেকে ডানে চলে গেল। একটু এগোতেই দেখি ডান দিকের ঝোপে দাঁড়িয়ে কতগুলো বাইসন, ওদের চোখেই দুর থেকে আলো পড়ে জোনাকির মতন দেখাচ্ছিল। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ওরা যেন আবার অরণ্যে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

মাদারীহাটের বুড়ি তোর্সার ব্রিজটা প্রবল জলের তোড়ে ভেঙ্গে গেছে। বাঁশের চাটাই দিয়ে পায়ে চলার একটা সাময়িক ব্যবস্থা হয়েছে। সাবধানে নদী পার হয়ে আতিথি নিবাসে পৌঁছালাম। ঘুম না আসার অনেক কারণ হয়, সদ্য ফেলে আসা স্মৃতির আবেশে কত ঘন্টা জেগে রইলাম কে জানে? সাকুল্যে হয়তো ঘন্টা তিনেক ঘুমিয়েছি, তবুও সকালে কোন ক্লান্তি ছাড়াই তৈরী হয়ে গেলাম কুমারগ্রাম যাবার জন্য।

সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কেটে গেল। প্রকৃতি আর মানুষের সারল্য যেখানে সহাবস্থান করে সেখানে পেটে খিদে পেলেও মনের সতেজতা অটুট থাকে। একটু বেলা করেই আমরা বারোবিশায় একটা খাবারের দোকানে খেতে ঢুকলাম। হাত ধুয়ে ভাতের থালার অপেক্ষায় বসে আছি, হঠাৎ একটা কথা শুনে পিছনে তাকালাম।

"ওই জংলিটা আবার আইসে," দোকানদার বলে উঠল। আরে! এ তো সেই গতকালের মহাদেবের মত লাগছে। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওকে চেনেন?" - ও এদিকে সেদিকে ঘোরে, দুই এক সময় খাবার চাইতে আসে। দুটো ভাত পেলেই চলে যায়। কথা বিশেষ বলে না।" পাশে বসা এক বৃদ্ধ বললেন, "ওডা ফাঁক পাইলেই জঙ্গলে যায়। পুলিশ ধরে আবার ছাইড়া দেয়। ওর কেউ নাই, রাস্তায় থাকে। শুনছি ওর বাপে নাকি মাহুত আছিল তাই মনে হয় ভয়ডর কম, বনবাদাড়ে মানুষ হওয়া তো।

মানসিক ভারসাম্যহীন! ভারসাম্য না থাকলে নাকি পাল্লা একদিকে ঝুলে যায়। মহাদেবের পাল্লার কাঁটা আসল আর নকলের মাঝে থাকতে থাকতে অকৃত্রিম অরণ্যের দিকে ঝুকে গেছে - তাই নির্ভয়ে চলে যায় বনানীর স্নেহ ক্রোড়ে। সেখানে কাঁটা ফুটলে ব্যথা লাগে না, কাউকে শত্রু মনে হয় না, হাতি শুঁড়ে পেঁচিয়ে আদর করে পিঠে চাপিয়ে নেয় মাহুতের ব্যাটাকে।

চিঠিওয়ালা

আজ সকালটা সত্যিই সুন্দর। এমনিতেই ব্যাঙ্গালুরুর আবহাওয়া বেশ স্নিগ্ধ, তার উপর নভেম্বরের নরম রোদ্দুরে চারিদিক ঝলমল করছে। হোটেল থেকে আমার সঙ্গীদের নিয়ে সকাল সকালই বেরিয়ে পড়লাম। প্রাতরাশ পথেই কোথাও সেরে নেওয়া হবে। আমাদের গন্তব্য দোড্ডাবালা নামে একটা ছোট তালুক। সেখানে কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করার উদ্দেশ্য।

রাস্তার ধারে একটা খাবারের দোকানে থামা হল। ইডলি, দোসা আমরা কলকাতাতেও খাই কিন্তু সেই অথেন্টিক স্বাদ সব সময় মেলে না। দোসাটা বেশ ভালোই বানিয়েছিল, কফিটাও অপূর্ব। যদিও কফি খাবার পর আমার একটু অম্বলের ধাত আছে তাই সাধারণত: এড়িয়ে চলি, কিন্তু কর্নাটকে এসে ফিল্টার কফি খাব না তা হতে পারে না। ঘন্টা দুয়েক গাড়ি চড়ার পর একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছালাম।

আড়ম্বরহীন অথচ বেশ রুচিসম্মত প্রধানা শিক্ষিকার কক্ষটা - এখানেই আমাদের তিনজনের বসার ব্যবস্থা হলো। বিদ্যালয়ের প্রধানের সাথে পরিচিত হওয়া সবসময়ই প্রথম কর্তব্য - এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। আমাদের কথা চলছে এমন সময় একটি ফুটফুটে শিশু কন্যা প্রধানা শিক্ষিকার ঘরে প্রবেশ করল। ওর নাম সৌম্যা। আজ ওর জন্মদিন, তাই আশীর্বাদ নিতে এসেছে। ভদ্রমহিলা দুই গালে দুই হাত রেখে মাথায় একটা স্নেহ চুম্বন দিলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, আজ সকালে একটা গাছ লাগিয়েছ তো?" বাচ্চাটা একেবারে কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে সানন্দে বলল, "হ্যাঁ, একটা ফুলের গাছ পুঁতে তাতে জল দিয়ে এসেছি।" কন্নড় আমি জানিনা; কথোপকথন পুরোটাই আমার স্থানীয় সঙ্গী শাম অনুবাদ করে দিল।

আমরা জিজ্ঞাসা করার আগেই ইনি বললেন, "আমাদের স্কুলের সব বাচ্চাই ওদের জন্মদিনে একটা করে গাছ লাগায়, যার যেখানে সম্ভব। ফ্ল্যাটবাড়িতে টবে হলেও চলবে, কিন্তু গাছ লাগাতেই হবে - এটা ওদের ভালোবাসা বা আকর্ষণ যা বলবেন।"

এমন সুন্দর রুচিবোধ এবং প্রয়াসের কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। আমরা সবাই ভদ্রমহিলাকে অভিনন্দন জানালাম। আরও ভাল লাগল এই জেনে যে এই কাজটা ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে শুনে। কত শুভ উদ্যোগ তো অল্পদিনেই হারিয়ে যায়।

সৌম্যার কাছে কয়েকটা কলম ছিল অন্যকে নিজের জন্মদিনে উপহার দেবার জন্য। কি সুন্দর শিক্ষা! বিভিন্ন রঙের ডটপেন গোছাধরা ওর হাতে, তার থেকে আমাকে বেছে বেছে একটা লাল কলম দিয়ে গেল। আধঘন্টাতেই এখানে বসে মনটা ভরে

উঠল। যেন জীবনের কিছু স্থায়ী সঞ্চয় জমা করলাম। কলমটাকে অতি যত্নে ব্যাগের ভিতরের খাপে রাখলাম যাতে হারিয়ে না যায় - এই অমূল্য স্মারক খোয়াতে চাই না।

একমাস পরের ঘটনা, আমরা সপরিবারে মিশরে বেড়াচ্ছি তখন। মিশর - মানেই নীল নদ, পিরামিড আর মন্দির।গিজা থেকে রেলে আসওয়ান এসেছিলাম। সেখান থেকে নদী পথে এক এক করে নানান দর্শনীয় স্থান ঘুরেছি। ইতিহাস আর সভ্যতার গভীরে অবগাহন করতে হলে মিশর এক অবশ্য গন্তব্য - এই উপলব্ধি যত ঘুরছি তত যেন দৃঢ় হচ্ছে।

এখন লাক্সর শহরে পৌঁছেছি। দিনটা পয়লা জানুয়ারি, নূতন বছরের শুরু। রানি হাটশেপসুতের সমাধি মন্দির দেখার পর আমাদের বাস একটা শিল্পীদের গ্রামে এসে থামল। এখানকার কারিগররা বংশ পরম্পরায় পাথরের মূর্তি নিপুন ভাবে খোদাই করে থাকেন। তারা কেমন করে কাজটা করেন সেটা দেখানো অন্যতম এক পর্যটন আকর্ষণ। একটা কারখানার সামনের উঠোনে বসলাম। সেখানে তিন-চার জন শিল্পী পাথর খোদাই করে চলেছেন। মূর্তিগুলো খুবই সুন্দর কিন্তু যারা তার রূপদান করছেন তারা যেন শ্রীহীন - মুখ-চোখ, জামা-কাপড়ে দারিদ্রের চিহ্ন স্পষ্ট।

এদের মধ্যে একজন উঠে এসে আদাব জানিয়ে বলল, "আমার নাম ইসমাইল, আমাকে দু - চারটে কলম দিতে পার? আমার বাচ্চা মেয়েটা লিখবে। ও প্রাইমারি স্কুলে পড়ে।"

শুভ্রা বলল, "দেখ না, তোমার ব্যাগে স্টক আছে কি না? আহা মায়া লাগে, কী সামান্য চাহিদা।" আমার পিঠে নেওয়ার ব্যাগটা আমার সর্বসময়ের সঙ্গী দেশে, বিদেশে - সর্বত্র। ভিতরের চেইনটা খুলতেই দেখি সেই সৌম্যার দেওয়া লাল কলমটা যেটাকে আমি সযত্নে রেখেছিলাম স্মারক হিসাবে। শুভ্রাকে বললাম, "এটাকেই আগে দাও।"

ইসমাইল সামনে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দু হাতে কৃতজ্ঞতাভরে কলমটা গ্রহন করলো। আর আমি? মনে মনে বললাম, "ইসমাইল, তুমি আমাকে কি দিলে জান না। তোমার জন্য আজ আমি হলাম এক চিঠিওয়ালা যে একটি শিশুর পবিত্র ভালোবাসা মহাদেশ পেরিয়ে অন্য এক শিশুকে পৌঁছে দিল।"

দশে দশ

রায়চকের গঙ্গার ঘাটে বসে থাকতে বেশ ভালো লাগে। নদীটা দক্ষিণ দিকে, ফুরফুরে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় পাড়ের সব কিছু। যখন জায়গাটা শান্ত থাকে তখন চায়ের দোকানের কাঁচের গ্লাসে চামচ ঘোঁটার মিষ্টি আওয়াজটাও বেশ শুনতে পাওয়া যায়, আবার সেই স্থানটাই কখন মানুষের কোলাহলে ভরে ওঠে। এক একটা যাত্রী বোঝাই বড় বড় যান্ত্রিক নৌকা ঘাটে এসে ঠেকে আর লোকজন প্রাণপনে ছুটতে থাকে আগে ভাগে বাসের টিকিট কাটার জন্য - কলকাতায় যেতে হবে যে অনেক সময় ধরে। টিকিট ঘরের ঠিক পাশেই যে চায়ের দোকানটা সেখানে কাঠের বেঞ্চে খালি গায়ে টান টান হয়ে শুয়ে থাকেন শম্ভুবাবু। শরীর ভালো না হলেও দোকানে আসার খামতি নেই। ওনার স্ত্রী বহু পরিশ্রমে ছোট ব্যবসা চালিয়ে যান। যাতায়াতের পথে সৌজন্য বশত: "কেমন আছেন?" জিজ্ঞাসা করতে গেলেই বিপদ, এক কাপ চা খেতেই হবে। দাম দিতে যাই না - ওতে ওদের ভালোবাসার অসম্মান হয়।

অনেক দিনের পরিচয়ে শম্ভুবাবুর বাড়ির অনেককেই চিনে ফেলেছি দোকানে যাতায়াতের সূত্রে। একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করি প্রত্যেকেরই চাহনিটা একটু অস্বাভাবিক ধরনের - চোখ কুঁচকে মাথাটা কাত করে অনেক কষ্টে চলাফেরা করে ওরা। সন্দেহ হল কিছু বংশগত সমস্যা আছে। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করতেই ভদ্রলোক বললেন, "আছেই তো, আমাদের বংশে অনেকেরই জন্ম থেকে চোখে ছানি আছে। গরিব মানুষ বাবু, চিকিৎসা করাতে পারিনি। আমাদের একটা নাতিকে আপনি অপরেশন করেছিলেন, ও ভালো আছে।" আমি বললাম, "কখনো বলেননি তো; সবারই তো ব্যবস্থা করা যায়।" শম্ভুদা বলে,"তাহলে আমার বোনটাকে একটু সাহায্য করুন না। ওদের বড় কষ্ট।"

ঠিকানা জোগাড় করা হলো। মোবাইল ফোনের দৌলতে খুঁজে পেতেও অসুবিধা হলো না। আমরা হাসপাতালের কয়েকজন শম্ভুবাবুর বোন পূর্ণিমার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। বড় রাস্তা ছেড়ে বিলের ধার দিয়ে হোগলা আর শোলার বন পেরিয়ে যে উঠোনে উপস্থিত হলাম সেখানে কোনরকমে একটা টালির ঘর দাঁড়িয়ে আছে। এর কাঠামোটা এতই দুর্বল যে ঝড় উঠলে ছেলেরা সমস্ত শক্তি দিয়ে খুঁটি ধরে থাকে যাতে ঘরটা ভেঙে না যায়। বাড়িতে মোট থাকে নয়জন মানুষ; তার মধ্যে পাঁচজন কোনরকমে ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে বেঁচে আছে। পূর্ণিমা লোকের বাড়ী পরিচারিকার কাজ করে কিছু উপার্জন করেন। "বাসনে এঁটোকাটা ভালভাবে পরিস্কার না হলে বাবা কত খারাপ কথা শুনতে হয়। লোকে কাজ ছাড়িয়ে দেয়"- বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন ভদ্রমহিলা। পূর্ণিমার দুই

ছেলে শঙ্কর আর তারক দিন মজুরের কাজ করে। সেখানেও সমস্যা - চোখে কম দেখে বলে মালিক কম মজুরি দেয়। শঙ্করের দুই ছেলে অমিত আর সুমিত। ওর স্ত্রী করুণা খুব বুদ্ধিমতী - পুরো অভাবের সংসারকে টেনে নিয়ে যায়। সুমিত চোখে কম দেখে বলে ওকে কেউ খেলায় নেয় না। পড়তে কষ্ট হয় বলে ও ক্লাসে 'ভালো ছেলে' নয়। সামান্য বড় দাদা অমিত সবসময় ভাইকে আগলে রাখলে। করুণা বলে,"ডাক্তারবাবু আমার বড় অশান্তি। ভাই চোখে কম দেখে বলে কেউ খারাপ কথা বললে বড়টা তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ফেরে। লোকে এসে আমাকে দুকথা শুনিয়ে যায়। কী আর করব বলুন?" এই পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্য ছোটু এখনো হামা দিয়ে চলে। উঠোনের রোদ্দুরে ছেড়ে দিলে চোখ কুঁচকে কোনরকমে হাতরে হাতরে মা - ঠাকুমার কোল খুঁজে নেয়। ছোটুর মা ললিতা হতদরিদ্র ঘরের মেয়ে - শ্বশুর বাড়িই তার একমাত্র আশ্রয়। ললিতা বাচ্চা কোলে নিয়ে কেঁদে আমার কাছে এসে বলে, "অন্ধ স্বামীকে বিয়ে করেছি, অন্ধ ছেলের জন্ম দিয়েছি - আমার কি হবে ডাক্তারবাবু?"

এবার কর্তব্যের পালা। দাওয়ায় আসন পেতে বসলাম। যাঃ! টর্চটা আনা হয়নি। এক প্রতিবেশীর কাছে টর্চ চেয়ে নেওয়া হলো। দেখা গেল পাঁচজনের চোখেই ছানি অপরেশন প্রয়োজন। ডাক্তাররা পাড়ায় এসেছে তাই আশেপাশের লোকজন জুটে যায়। কারও চোখে জল পড়ে, কারও চুলকায় - একটু দেখে দিতে বলে। তার মধ্যেই ভেসে আসে এক মহিলার কণ্ঠস্বর, "উহ! ডাক্তার ডেকে এনেচে। কেউ আবার ফটোক তুলতেছে। কানার বংশ - অভিশাপ আছে না। এরা কি কোনদিন ভালো হয়? একবার অপরেশন করে ভালো হলেও আবার অন্ধ হবে।"

অনেক ভেবে চিন্তে নিজেকে সংযত রাখলাম - উত্তর দিলাম না। ভবিষ্যতই ওদের চোখ খুলে দেবে।

অপরেশন পর্ব শুরু হল। পাঁচজনেরই একটা করে চোখের মাসখানেকের মধ্যে অস্ত্রোপচার হয়ে গেল। আনন্দের কথা প্রত্যেকেরই দৃষ্টির প্রত্যাশিত উন্নতি ঘটল - সবাই খুশি। একই পরিবারের এতজন মানুষকে একই সময়ে চিকিৎসা করার অভিজ্ঞতা এর আগে কখনো হয়নি। সে কারণেই আমাদের দলের মনোযোগ এদের প্রতি প্রত্যাশিত ভাবেই একটু বেশি। সাধারণত রোগীর বাড়িতে গিয়ে চোখ দেখে আসা সচরাচর ঘটে না। এক্ষেত্রে তারও ব্যতিক্রম ঘটল। পরিবারটার সাথে অল্প সময়েই কেমন একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠল। দেখতে যেতাম ওরা অপরেশনের পর কেমন আছে। বিপদ একটাই - আগে থেকে জানতে পারলে আমাদের আতিথেয়তার জন্য ওরা যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে পড়তো। অনেক কষ্টে দোকান থেকে মিষ্টি আনানোটা বন্ধ করালাম।

দেড় দুই মাস পর যখন দেখলাম প্রথম অপরেশন হওয়া চোখের সেরে ওঠা নিয়ে আর বিশেষ চিন্তার কোন কারণ নেই তখন প্রস্তাব দিলাম, "এবার সবাই অন্য চোখগুলো

করিয়ে নাও।" খরচ যখন প্রতিবন্ধক নয় তখন অরাজি হবার কোন কথা ওঠে না। ওরা রাজিও হয়ে গেল, কিন্তু ঠেকে গেলাম এক জায়গায়। পাঁচের মধ্যে তিনজনের দুটো করে চোখের অপরেশন হয়ে গেল অল্প দিনেই, বাদ রইল শঙ্কর আর তারক।

- "ওদের কবে হবে গো?' পূর্ণিমা সবিনয়ে বলে,"হবে ডাক্তারবাবু, তোমরা বাবা এতকিছু করছ আমাদের জন্য, হবে না কেন?"

মাসের পর মাস চলে যায়। দু তিন বার মনে করালাম, কাজের কাজ হল না। এরা আবার ঘন ঘন মোবাইল বদল করে - যখন যে কোম্পানী সস্তায় দেয় সেটাই ধরে। আগের নাম্বারে যে ফোন করে ধরব তার উপায় নেই। পূর্ণিমার বাড়ির লোকেদের এখন আর ঘন ঘন হাসপাতালে দেখাতে আসতে হয়না তাই যোগাযোগটাও একটু কমে গেল। অগত্যা একদিন রায়চকে শম্ভুদাকে ধরলাম, "ভাগ্না দুটোর কী হলো গো? একটা চোখ কাটিয়ে অন্য চোখ অপরেশন করানোর নাম নেই? অসুবিধাটা কী?"

"বসুন ডাক্তারবাবু। এই, চা দাও স্যারকে। কদিন আগে বড় বউমা বাপের বাড়ি এয়েছেল। বললো তো সব ভালো আছে। কী জানি কেন করায় নি? খোঁজ নেব খন।"

কদিনের মধ্যেই শঙ্কর এসে হাজির হাসপাতালে - মামা বলে পাঠিয়েছে। "কী হল গো? দশটা চোখের মধ্যে আটটায় ঠেকে আছি যে, দশে দশ হবে তো?"

"ডাক্তারবাবু, একটা করে চোখ অপেরেশনের পর এখনতো মোটামুটি দেখা পাই, তাই দু ভায়ে একটা ভ্যান রিস্কা কিনিচি । যত তাড়াতাড়ি হয় ধারটা শোধ করতে হবে। দেরী হলে সুদ অনেক বেড়ে যাবে।"

- "কত সুদ দিতে হয়?" "তা অনেক ডাক্তারবাবু, মহাজনের সুদ তো।"

- "ব্যাঙ্ক দেয় না?"

– "কে ধরা করা করবে বল? ব্যাঙ্কে কেউ চেনা নেই।" শঙ্কর বলতে থাকে, "অপরেশনের পর তো কিছু দিন বিশ্রাম নিতেই হবে। তখন তো আর ভারী মাল টানতে পারবো না। টাকা শোধ হয়ে যাক, ঠিক অপরেশন করাতে আসব। আসব না কেন বল? আমাদেরই তো ভাল।"

আশ্বস্ত হলাম, সবার দুটো করে চোখ অপরেশন হয়ে গেলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ঠিকই বলেছে শঙ্কর। যে কারণে ওরা দেরী করছে তা তো আমাদের ভাবনায় আসে না - মানুষের কতটুকুই বা আমরা খবর রাখি?

সামনে দীপাবলি। জিজ্ঞাসা করলাম,"তোমাদের বাড়িতে কালীপূজোর আগের দিন চোদ্দ প্রদীপ জ্বালা হয়?" - "হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু ।"

"ঠিক আছে, তাহলে ওই দিন তোমাদের বাড়ি যাব। বিকেল নাগাদ ছেলেদের নিয়ে আমতলা বাজারে এসো।"

ভূতচতুর্দশীর দিন ওদের পছন্দ মতন কিছু রং মশাল, মোমবাতি ইত্যাদি কিনে

শঙ্করের বাড়ি চললাম। সাথে কিছু মিষ্টিও নেওয়া হল - সবসময় শুধু ওদের বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসি। সন্ধ্যাবেলা ওরা আনন্দ করবে আর আমরা উপভোগ করব - এই লোভে যাওয়া। পূর্ণিমার বাড়ি পৌঁছে দেখি উঠোন, - দাওয়া সব সুন্দর করে গোবরমাটি দিয়ে নিকানো। ফনিমনসা আর তুলসী মঞ্চে চালের পিটুলির আল্পনা। একটা থালায় শুকানো আছে হাতে গড়া মাটির চোদ্দটা প্রদীপ - সলতে আর সর্ষের তেলের অপেক্ষায়। ছোটু এখন হাঁটতে পারে, দু চোখে চশমা এঁটে ঢোলা প্যান্ট পরে থপ থপ করে চলছে। সুমিত এখন এক প্রণোচ্ছল কিশোর - দেখার অসুবিধা আর তাকে আটকে রাখে না। অমিতকে জিজ্ঞাসা করলাম, "হ্যাঁ রে, ভাই এখন দেখতে পায় - তোর কেমন লাগছে?"

মাথাটা নেড়ে বললো "ভালো", কিন্তু বড় গম্ভীরভাবে - মুখে ভাল বা মন্দের কোন প্রকাশই নেই। আবার জিজ্ঞাসা করলাম,"তোর আনন্দ হচ্ছে না?" এবার যেন নদীর বাধ ভেঙে গেল। অকস্মাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে অনেক অনুপস্থিত মুখের দিকে ঘুষি পাকিয়ে প্রবল প্রতিবাদ ছুঁড়ে দিতে লাগল। "আয়, আর ভাইকে কেউ কানা বলবি? দেখবি তোদের খেলায় হারিয়ে দেবে। এক বলে বোল্ড করে দেবে। তোরা শুন্য পাবি। এবার খেলতে নিবি না? আর তোরা ঠকাতে পারবি না।" একটা কিশোর তার অন্তরের ব্যথা, ক্ষোভ, প্রতিবাদ এক মূহুর্তে উগরে দেয় প্রার্থিত সাফল্যকে হাতে পেয়ে। আনন্দের এইরকম বহিঃপ্রকাশ জীবনে কখনো দেখিনি। এমনভাবে একটা নীরব মুখ যে মুখর হয়ে ওঠে - তাও অজানা ছিল। ওর মা বলে, "ওরে থাম, কঁদিস নি। নে, দু ভায়ে মোমবাতি সাজাতে লাগ।"

আমি বললাম, "ওকে কাঁদতে দাও, হালকা হোক, ও খেলায় জিতে গেছে।"

এরপর আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দুই ভাই একসাথে এসে বলে, "ডাক্তারবাবু, রিস্কার ধার শোধ হয়ে গেছে। এবারে অন্য চোখ দুটোর অপরেশন করে দাও।"

ইতিমধ্যে বেশ কিছু কাল কেটে গেছে। দুই ভাই, তাদের মা ও ছেলেরা সবাই ভাল আছে। আজ পূর্ণিমা নাতিকে নিয়ে এসেছিল নূতন চশমা করাতে। ছোটু পড়া শুরু করবে - পাড়ার শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে যাবে। এখন সত্যিই মনে হচ্ছে দশে দশ পাওয়া গেল।

দেশ

ঘড়িতে বেলা একটা বাজে। খাবার টেবিলে বন্ধুদের সাথে আর গল্প করা চলে না–এয়ারপোর্ট পৌঁছাতে হবে। ঢাকা শহরের যানজটকে বিশ্বাস নেই। স্যুটকেস, ব্যাগ, সব একবার নিরীক্ষণ করে নিলাম। মনে হয় সব ঠিকঠাক গুছানোই আছে। একটা ছোটো প্যাকেট নিয়ে একটু চিন্তা হতেই থাকল। এটা চেক ইন লাগেজে স্যুটকেসে ভরব নাকি হাতব্যাগে সঙ্গে থাকবে। ছোটো একটা জিনিস হাতের মুঠোয় এসে যায়, যেখানে হোক রাখলেই হল। স্যুটকেসে যদি X Ray Check-এ সন্দেহ হয় তবে তো স্যুটকেস আর কলকাতাই পৌঁছাবে না, বরং হাতব্যাগে সিকিউরিটি ম্যান এর সময় জিজ্ঞাসা করলে দেখিয়ে দেব – এটা বিপজ্জনক কিছু নয়। আতাউর অবশ্য বলেছিল, "স্যার হাতব্যাগেই নিয়ে নেবেন।"

বাংলাদেশে এটা আমার কততম যাত্রা তা মনে নেই–সবই এসেছি কর্মসূত্রে। এর সথে যতটা পেরেছি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের খ্যাত-অখ্যাত দ্রষ্টব্যের সাথে পরিচয় করেছি। তার সাথে সঞ্চিত হয়েছে আন্তরিক আতিথেয়তা। এবারের ঘটনার সুত্রপাত গতবছর ময়মনসিংহের নিকটবর্তী জামালপুর শহরে। সেখানে চিকিৎসা শিক্ষার সূত্রে এক সপ্তাহ ছিলাম। একদিন রাত্রে খাবারের টেবিলে হাসপাতালের ম্যানেজার সাইফুল জিজ্ঞাসা করল "স্যার আপনার পূর্বপুরুষের দেশ শুনলাম বরিশাল ?"

"হ্যাঁ" "ঠিকানা বলতে পারবেন, ঠিক খুঁজে বার করব, আমিও বরিশালের।"

সাইফুল বেশ আত্মবিশ্বাসী।

আমি বললাম আমি শুধু দুটো স্থান নাম জানি, কারণ ছোটোবেলায় পিসিমাকে চিঠি লেখার জন্য মা আমাকে দিয়ে পোস্টকার্ডে ঠিকানা লেখাতেন গ্রাম রামনগর, থানা বাখেরগঞ্জ তাও আবার পোস্টঅফিসের নাম ভুলে গেছি। দুদিনের মধ্যেই সাইফুল সানন্দে জানাল - "পাইয়া গেসি, স্যার, সম্ভবত গ্রামটা নিয়ামতি অঞ্চলে।" "হওয়াটা যথেষ্ট সম্ভব এইজন্য যে বাবা, ঠাকুর্দা, পিসিমার কথোপকথনে নিয়ামতি নামটা শুনেছি। সাইফুলের আগাম নিমন্ত্রণ পেলাম।

"এরপর যখন বরিশাল হাসপাতালে আপনি পড়াতে আসবেন তখন আপনাকে আপনার পূর্বপুরুষের গ্রামে নিয়ে যাব।" মনে সম্ভাবনা জাগল তা একদিন সত্যি হবে। কিন্তু রামনগরে পদার্পণ ছাড়া তো আর কিছু আশা করি না।

কলকাতায় ফিরে একমাত্র যে আমাকে কিছু হদিশ দিতে পারত সেই পিসতুতো দাদার কাছে কিছু সূত্র চাইলাম যাতে রামনগরে ভিটে খুঁজে পেতে পারি। দাদার স্কুলের পড়া ওই গ্রামেই তাই তার পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল।

"ধুস্, এটা সম্ভব নাকি। কত পরিবর্তন ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, এখন কি আর পুরনো জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে।" অতএব আমাকে পরবর্তী বাংলাদেশ যাত্রায় রামনগর ভ্রমণের উৎসাহটা একটু সংযত রাখতে হল। দাদা বললেন, "বরং তুই বরিশাল শহরে অশ্বিনীকুমার টাউন হল দেখে আসিস, ওই বাড়ির দোতলার ডান দিকের ঘরেই মামা কংগ্রেস পার্টি অফিসে থাকতেন। ওইটাই তোর প্রকৃত বাবার বাড়ি।" আবার বরিশাল ভ্রমণের সুযোগ এল এবছর আষাঢ় মাসে, তখনও বৃষ্টি বিশেষ নামেনি। ঢাকা থেকে চার চাকার গাড়িতেই যাওয়া হল।

মানিকগঞ্জে স্টিমারে গাড়ি চাপিয়ে পদ্মাপার, অতঃপর গোয়ালন্দে ইলিশ মাছ সহযোগে মধ্যাহ্নভোজ সারা হল। সন্ধ্যায় যে হোটেলটিতে পৌঁছালাম সেটাতে বেশ অভিনবত্ব চোখে পড়ল। হোটেলটির ভিতরকার বহু অলঙ্করণই জীবনানন্দের কবিতা দিয়ে করা। শহরের ভূমিপুত্র কবিকে এরকম সম্মানিত হতে অন্য কোথাও দেখিনি। পরেরদিন আমাদের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল, জীবনানন্দ সভাগৃহে যেটি এককালে তাঁর বাড়ি ছিল। এই ভ্রমণপর্বে এটাও এক উপরি পাওনা।

আমার ছাত্রদের সাথে পরিচয় পর্ব শুরু হল। আরিফ এবং নজরুল আমার পূর্বপরিচিত, এবারের নতুন সংযোজন আতাউর। আতাউরের পরিচয় জানতে চাইলে ও বলল ওর বাড়ি ঢাকায়। কিন্তু ওর উচ্চারণের ঢঙে আমি বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে ফেললাম, "তোমার দেশ কি পশ্চিমবাংলার চব্বিশ পরগনা সীমান্ত সংলগ্ন ?"

"ছার ঠিক বুঝি ফেলিসেন, সবাই ধরতি পারে না" – আতাউরের স্বীকারোক্তি।

আপনারা যেমন এদেশ ছেড়ে ভারতে গেছেন, আমাদের পরিবারও দেশভাগের পর পাকিস্তানে চলে আসে। ঢাকা শহরে আমাদের পরিবার থাকতে আরম্ভ করে।" ও বললো। মনে মনে বললাম এখানেই আতাউর ও আমি এক। কলকাতার এক বিশিষ্ট কবি আমার এক অনুজকে বলেছিলেন, "তুমি কোনোদিন বাংলাদেশে গেছ?"

ও বলেছিল, "ওখানে আমার কী আছে? আমি তো ভারতে জন্মেছি।" উনি বলেছিলেন, "তুমি গল্পে গল্পে যাচ্ছ। একবার সত্যি গিয়ে দেখবে কী অনুভূতি হয়।"

হ্যাঁ অনুভূতি সত্যিই হয়। তবে একথা সততঃ সত্য যে অনুভূতি বিষয়টা একান্ত ব্যক্তিগত। 'দেশ' কথাটার সঙ্গে যেখানে 'ভাগ' শব্দটি সমাসবদ্ধ হয়নি সেখানে পূর্বপুরুষের জন্মভূমি সম্পর্কে কারও আগ্রহ বা আবেগ থাকা একেবারেই প্রত্যাশিত নয়। আমার জন্ম পশ্চিমবাংলায়। তাই বাবা-ঠাকুর্দা, পিসি-মাসিদের বলা বরিশাইল্যা কথ্য ভাষা ছাড়া সে দেশের কোনো পরিচয়ই আমার ছিল না। ছোটোবেলায় কিছু আত্মীয়স্বজনকে আমাদের বাড়িতে আসতে দেখেছি, কথোপকথন শুনেছি। এইসবের মধ্য দিয়ে দেশ সম্পর্কে আমার কল্পনার জগতে যে চিত্র তৈরি হত সেটাই আমার কাছে আমার শিকড়ের কল্পিত পরিচয়। আমার কাছে আমার জন্মভূমি চব্বিশ পরগনার

গোবরডাঙ্গা "আমার দেশ"। সেখানে পূব দিকে নারকেল গাছের সারির ফাঁক দিয়ে সূর্য উঠত, সেদিকে মুখ করলে বাঁদিকে ছিল পুকুরঘাট মানে উত্তরদিক। এইভাবেই ছোটোবেলায় দিক চিনতে শিখেছিলাম। এখনও কোনো নূতন জায়গায় দিক মেলাতে গেলে ভোরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে বামদিকে মনে মনে পুকুরঘাটটা খুঁজি উত্তর বুঝতে। ডানদিকটা তাহলে দক্ষিণ হয়। স্মৃতিতে সেখানে চলে আসে চওড়া প্রাচীর যার উপর বসে শুয়ে গরমকালে দক্ষিণের হাওয়া খেতাম। আমার শিকড়ের সন্ধান কোনোদিন করব এরকম অদম্য ইচ্ছা কোনোদিন হয়নি, শুধু বাংলাদেশটা অবশ্যই দেখব এরকম গভীর ইচ্ছা অনেকদিনই মনে লালিত ছিল। বাংলাদেশে আমি জন্মাইনি অতএব বাংলাদেশে আমার জন্য কী অপেক্ষা করে আছে সেই ভাবনাটা আমার কাছে অবান্তর ছিল। কিন্তু কর্মসূত্রে যখন দেশটাতে প্রথম পা রাখলাম বেশ বুঝলাম এ এক অন্যরকম অনুভূতি। একবারও মনে হল না এটা বিদেশ। নস্টালজিয়ার প্রথম স্বাদ পেলাম ঢাকার স্টিমার ঘাটে যখন ভোঁ বাজিয়ে একটার পর একটা জলযান ছাড়তে আরম্ভ করল। মুখের সামনে হাতের তালুটাকে নাক বরাবর খাঁড়া করে আমাদের দাদামশার অবিকল ইস্টিমারের আওয়াজ নকল করতেন। তার সাথে স্টিমার যাত্রার নিপুণ বর্ণনা আমরা নাতি-নাতনির দল গভীর আগ্রহে শুনতাম।

বরিশালের কার্যক্রমের প্রথম দিনই আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী লুৎফুলভাই বললেন, "দাদা তৃতীয় দিনে আমরা আপনার দেশের বাড়ির সন্ধানে যাব, ওইদিন বেলা ৩টার মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করতে হবে।"

হলও তাই। দেখলাম ফারুক বেশ বড় একটা গাড়ি তৈরি রেখেছে। আমার সব ছাত্ররা আমার সঙ্গী হল, ছ সাতজন মিলে বাখেরগঞ্জের দিকে রওনা হলাম। কীর্তনখোলা নদীর উপর কয়েক বছর আগে একটা সেতু তৈরি হয়েছে তাই যাত্রা বেশ সুখকর। নয়তো এখনকার দেড়ঘণ্টার দূরত্ব এককালে নাকি আধবেলার সমান ছিল। বাখেরগঞ্জের মোড় পর্যন্ত বড়ো রাস্তাতেই গাড়ি চলল, এরপর ডানদিকে সরু রাস্তা ধরল। এই রাস্তাটা খালের পাড় বরাবর। দেখতে দেখতে চললাম খালের মধ্যে পণ্যবাহী নানা মাপের নৌকো, কোনোটাতে ইট, কোনোটাতে শস্যের বস্তা। আবার কিছু কিছু বাড়ির সামনে বেঁধে রাখা আছে ছোটো ছোটো নৌকো অনেকটা ঘরের নিজস্ব সাইকেলের মতন। কোথাও নৌকোতে বসেই ভাত খাওয়া, খালের জলে মুখ ধোওয়া চলছে, কোথাও ছেলেরা নুয়েপড়া জামগাছ ধরে উঁচু ডালে উঠে সেখান থেকে জলে বারংবার ঝাপ দিচ্ছে। কোথাও দেখা যায় মহিলারা বড়শি দিয়ে অপরাহ্নে মৎস্য শিকার উপভোগ করছে। সবে মিলে খালটা বেশ একটা প্রাণবন্ত চরিত্র মনে হল। আমি মাঝেমাঝেই গাড়ি থামাতে অনুরোধ করতে লাগলাম দৃশ্য উপভোগ এবং ছবি তোলার জন্য।

বাংলা বাজার ছাড়ানোর পর ফারুক বলল, ''সার আর বেশিদূর বাকি নাই।" আমি চোখ খোলা রাখলাম কোথাও রামনগর লেখাটা দেখতে পাই কিনা। লুৎফুল ভাই বললেন, "দাদা যেখানে রামনগর লেখা একটা সাইনবোর্ড পাব সেখানেই আপনাকে দাড় করিয়ে একটা ছবি নেব।'' হ্যাঁ, সেটাই হবে আমার সান্ত্বনা পুরস্কার। খালের বাম ধারে মহেশপুর গ্রামের বাজার ছাড়ানোর পর ব্রিজ পার করে ডান হাতে অগ্রসর হতে হল। এটাই রামনগর গ্রাম। যত দোকানপাট সব মহেশপুরে, রামনগর লিখিত কোনো সাইনবোর্ড তাই পাওয়াই গেল না। দুধারে ঘন সবুজ গাছের মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটা গিয়ে একটা মাদ্রাসা চোখে পড়ল যার ফলকে রামনগর লেখা আছে। এই তাহলে আমার পূর্বপুরুষের গ্রাম। গাড়ি থেকে নেমে দু-চার পা এদিক-ওদিক হাঁটলাম। ছবি তুললেন লুৎফুল ভাই। গন্তব্য যখন পাওয়া এবং দেখা হয়ে গেছে এবার তাহলে ফেরা যাক।

ফারুক এই সফরের আয়োজক। ওর ঠিক এত কমে মন ভরল না। আমাকে বলল, সার, একটু খোঁজ করবেন না আপনাদের বাড়ি কোথায় ছিল?"

– " কে বলবে? বাবা তো ১৯৫৮তে দেশান্তরে গেছেন। অত্যন্ত বয়স্ক মানুষ ছাড়া কারও পক্ষে চেনা সম্ভব নয়।" আমি বললাম।

ইতিমধ্যে এক বয়স্ক ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হলেন। ফারুক অনুরোধ করল "মুরুব্বি, ডাক্তারসাহেবের সাথে একটু কথা বলবেন?" ভদ্রলোক সানন্দে রাজি হলেন।

–এখানে কি কোন শীল পরিবার থাকে?" আমি জানতে চাইলাম।

–"ছেলে তো (ছিল তো), হ্যারা (তারা) কবে উড্ডিয়া (উঠিয়া) ইণ্ডিয়া চইল্যা গেসে।"

ফারুক অনুরোধ করল অন্তত সেই বাড়িটা দেখিয়ে দেবার জন্য। ভদ্রলোক আমাদের গাড়িতেই চড়ে বসলেন। সেই বাজারের কাছেই আমরা আবার পৌঁছে গেলাম। মুরুব্বির ধারণা অনুসারে শীলেদের বাড়ি ছিল তালুকদার বাড়ির পাশে। কিন্তু দেখা গেল সেই বাড়িগুলো কয়েকঘর পাল পরিবারের। প্রাচীন একটা জরাজীর্ণ মন্দিরের পাশে নূতন দুর্গা মণ্ডপ রয়েছে। অনুষ্ঠানাদি হয় বেশ বোঝা গেল।

শীল বাড়ি খুঁজে পাওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও রইল না। খুঁজে পাব এই প্রত্যয় ছিল না, তাই হতাশার কোনো কারণ নেই। খালের উপর ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি খালের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম, যতক্ষণ পারা যায়। কয়েকজন বৃদ্ধ আমার কাছে এসে বললেন, "অনন্ত কেরানির বাড়ি খোঁজ করতে পারেন।" মনের মধ্যে হঠাৎ একটা যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল। স্বর্গীয় অনন্তকুমার শীল আমার বাবার কাকাবাবু, যাকে আমার ছোটোবেলায় বারদুয়েক দেখেছি আমাদের গোবরডাঙ্গার বাড়িতে। উনি সরকারি চাকরি করতেন বলে গ্রামে 'কেরানি' নামে পরিচিত ছিলেন। শুনেছি উনি নানা

সামাজিক কাজকর্মে বেশ উৎসাহী ছিলেন তাই বোধহয় এখনও গ্রামে তার নামটা প্রচলিত আছে।

"হ্যাঁ ওই বাড়িই হবে।" আমি বেশ জোর দিয়েই বললাম ।

ভদ্রলোকরাই এক গ্রামবাসীকে দিয়ে দিলেন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। লোকটিকে খুব একটা চালাকচতুর মনে হয়নি, বরং উল্টোটাই ভেবেছিলাম। তাই যখন সে আমাদের সুপুরি বাগানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়ে নিয়ে চলল, কখনো কখনো মনে হতে লাগল, "ঠিক চলেছি তো?" মাঝখানে দুটো এমন সাঁকো পার হতে হল যেন উল্টে পড়ি আর কি! একটায় ডান হাতে ধরার বাশ ছিল, অন্যটায় তাও নেই, শুধু একটা সরু গাছের ডাল দুটো ভুখণ্ডকে জুড়ে রেখেছে। দৃশ্যটা বড় ব্যঞ্জনাময় । অতি সাবধানে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মনে হল মানুষে মানুষে সম্পর্কটাও ঠিক এইরকম – আপাত তুচ্ছ কিছু বস্তুই আত্মীয়তা ধরে রাখে।

অবশেষে অনন্তবাবুর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। দু তিনটি তুলসী মঞ্চের পাশ দিয়ে আঙিনায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনটে দিকে ছোটো বড়ো মোট চারটি ভিটে, নতুনটি পাকা বাড়ি, অন্য তিনটির পাকা ভিত, দেওয়াল এবং ছাদ টিনের। একজন অল্পবয়সী মহিলা উঠোনে দুটি শিশু নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথম পরিচয় তো দিতে হয় তাই জিজ্ঞাসা করলাম,

-"এটা কি শ্যামসুন্দরবাবুর বাড়ি?" এই বাড়ির এই একজনের নামই আমার জানা ছিল।

–হ্যাঁ, উনি তো ঢাকায় থাকেন।

জানতাম আমি সেটা কিন্তু আমাদের পরিবারের সাথে শ্যামসুন্দরবাবুর দীর্ঘ বছর কোনো যোগাযোগ নেই। বুঝলাম আমি সঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছি। বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ ছিলেন না, সবাই হাটে গেছিলেন। আমি কোনো বয়স্ক মানুষকে ডেকে দিতে বললাম এই আশায় যে অন্তত আমার বাবা-ঠাকুর্দাকে নামে চিনবেন।

–"শাশুড়ী মা বাড়ি আছেন, শরীর ভালো নাই।"

–"তবুও ডেকে দিন", অনুরোধ করলাম। আমি দাওয়াতে বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। যিনি কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে এলেন তিনি সম্পর্কে আমার কাকিমা হন। দেখলাম উনি আমার পূর্বপুরুষের নামের সাথে পরিচিত। আফশোস করতে লাগলেন বাড়িতে ওনার স্বামী বা ছেলে নেই বলে। কিঞ্চিৎ বিপদেও পড়লেন এতগুলো লোককে কী দিয়ে আপ্যায়ন করবেন বলে। আমি বললাম, 'শুধু একটু জল খাব।' তাই হয়, 'তুমি এই বংশের পোলা, পেত্থম আইছ।' বলে কাকিমা ভিতরে গেলেন।

তাহলে আমার দেশের বাড়ি পেয়ে গেছি! টুকরো টুকরো কত কথোপকথন মনে

পড়তে থাকে। দুর্গম নদী খালের দেশ ছিল বরিশাল আমার বাবার শৈশব ও যৌবনকালে। নৌকায় আর পায়ে হেঁটে দীর্ঘপথ আসতে হতো।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমার পিসতুতো দাদা একবার বলেছিল, ''দাদুর হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে যখন পা ব্যথা হয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, ও দাদু আর কত দূর?'' দাদু বলতেন, ''বেশি দূর নাই - ঐ যে গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য দেখা যায় ঐখানে যাব।'' তাহলে সেই সূর্যের গ্রামে এসে পৌঁছালাম? এখানেই আমার শিকড়?

আতাউর বলল, 'সার, পুকুর ঘাটটা দেখে যান। পিছন দিকে গেলাম, একটা মাঝারি মাপের পুকুর, শান্ত জল টলটল করছে। আতাউর আবার বলে 'সার, পিছনের দরজাটা দেখেন, পুরানো কাঠের কারুকার্য, নিশ্চয় খিড়কি দুয়ার হবে। বাল্যবিবাহিতা পিসিমা তার বিয়ের বর্ণনা দিতেন এই বলে, 'বাড়িতে বাজনা বাজে আমিও নাচি, তখন কে জানে ওটা আমার বিয়ের বাজনা। স্বচক্ষে দেখলাম এই পুকুর, এই খিড়কি যেন পিসিমার খেলার জায়গা ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার, বাড়িটাকে আমি না যতটা ঘুরেফিরে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি, আতাউরের আগ্রহটা যেন আরও বেশি– ওই আমাকে বিভিন্ন আনাচ-কানাচ খুঁজে দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে কাকিমা একটা থালায় কয়েকটা দুধের পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন আমাদের সবার জন্য। আরিফ বলল, আমি যখন পুকুর ঘাটে ছিলাম তখন বৌমাকে দিয়ে গাই দুইয়ে এনেছেন বংশধরের আপ্যায়ন করার জন্য। টাটকা দুখ গরম করে বিস্কুট সহযোগে পরিবেশিত হচ্ছে। আবার মনে পড়ে গেল পিসিমার কথা। যখন ছোটোবেলায় প্রথম আমার মুখ দেখেছিলেন তখন আমার মার কাছ থেকে দুধের বাটি আর চিনি নিয়ে আমাকে খাইয়ে প্রথম পরিচয় করেছিলেন। এটাই বোধহয় বংশের রীতি।

এবার বিদায়ের পালা। কাকিমার কাছে আমার ফোন নম্বরটা রেখে এলাম যাতে যোগাযোগ থাকে। আবার রামনগর যাব কথা দিলাম। উঁচু দাওয়া থেকে নেমে আসছি, দেখি আতাউর হাতে একখণ্ড মাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য। "সার, এটা সঙ্গে নিয়ে যান।" আমি আনন্দে, শ্রদ্ধায়, আবেগে, ভালবাসায় সেটা গ্রহণ করে উঠোনে পড়ে থাকা পাতায় তাকে মুড়ে নিলাম। আবার আবিষ্কার করলাম, মনোজগতে আতাউর আর আমি এক, আর আমাদের দুজনের নেপথ্য নায়ক 'দেশ'।

মাটির টুকরোটাকে সযত্নে বাড়ি আনতে পেরেছি– কোনো সিকিউরিটি, কোনো কাস্টমস্ আটকায়নি। বাড়ি আসার পর শুভ্রাকে দেখালাম।

ও পশ্চিমবঙ্গীয় পরিবারের মেয়ে আমার আবেগের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক ওর থেকে। আমাকে শুধু বলল, "যত্ন করে রাখ, তোমার জন্য একটা সুন্দর কোটো কিনে দেব মাটিটা রাখার জন্য।"

দুই বোন

এই অভিজ্ঞতাটাও ডাক্তারি সূত্রে পাওয়া। কিছু দিন আগে একটা অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করলাম। শকুন্তলা হালদার আর মর্জিনা বিবি একই দিনে আমাদের হাসপাতালে দেখাতে আসেন, এবং একই সময়ে। শকুন্তলা ডায়মন্ড হারবার আর মর্জিনা কুলপির বাসিন্দা। দুটো জায়গায় মাঝে দূরত্ব খুব বেশী নয়; তাই হয়তো পূর্ব পরিচিত দুজনে।

বেশ কিছুদিন দেখা সাক্ষাতের সুবাদে ব্যক্তি মানুষ দুজনকেও একটু চিনেছি। শকুন্তলা একটা বাচ্চাদের স্কুল চালান তাই কথায় বার্তায় বেশ সপ্রতিভ, হাসিখুশি মহিলা। আগে ওনার স্বামী নিয়মিত আসতেন সঙ্গে; এখন শকুন্তলা একাই আসেন। মর্জিনা একেবারে ঘোমটা টানা গাঁয়ের বধু; সবসময়ই স্বামীকে সাথে আসতে হয়। লুঙ্গি আর জামা পরা মানুষটা একেবারে সাদাসিধে। কখনো কখনো কোলে একটা বাচ্চাও থাকে দেখি।

যখন একই দিনে আসার ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ দেখলাম না তখন আমার একটু অনুসন্ধিৎসা জাগলো। হ্যাঁ, দুজনের চোখের সমস্যা একই ধরনের; দুজনের চোখে একই দিনে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এটাই বড় মিল।

চোখের মনি (কর্ণিয়া) বদলের পর দীর্ঘ দিন চিকিত্সা চলে; প্রথম দিকে ঘন ঘন ডাক্তারের কাছে আসতে হয়। এর পর ব্যবধান বাড়ে কিন্তু আসা বন্ধ করা চলে না। প্রয়োজনে ওষুধ বদলাতে হয়, যোগ বিয়োগ ও করতে হতে পারে।

বছর ঘুরে গেছে, দুজনেই মোটামুটি ভালো আছেন। দুজনে সেই একই দিনে আসে, লক্ষ্য করি অপেক্ষা করতে করতে বেশ জমিয়ে গল্প করে।

এবার শকুন্তলাকে প্রশ্ন করেই ফেললাম, - "আপনারা দুজনেই দেখি বরাবর একই দিনে, একই সময়ে আসেন। তাই না?"

বুঝলাম ভদ্রমহিলা প্রশ্নটা পছন্দ করলেন। উত্তর দিলেন, " ডাক্তার বাবু, আমাদের তো একই দিনে অপারেশন হয়েছে; এক সাথে কদিন পাশাপাশি বিছানায় ছিলাম - তাই বন্ধুত্ব।'' না, এটা সাধারণ বন্ধুত্বের থেকে আরও বেশি!

শকুন্তলা বলে চলে, "আপনাদের নাকি বলা বারণ কার চোখ কাকে দেওয়া হয়েছে- আইন আছে। এক জোড়া চোখ সংগ্রহ হতেই আপনারা আমাদের ফোনে ডেকে আনেন। তাই মনে হয় একই মানুষের দুটো চোখ আমরা ভাগ করে নিয়েছি। সেটা ভাবলে তো আমরা দুজন যমজ বোন।''

দেখি শকুন্তলার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল আর মর্জিনার দাঁতে চেপে ধরা ঘোমটার পিছনে সলজ্জ মুচকি হাসি।

গানের সুরে

''আমরা এসে গেছি ডাক্তারবাবু'', দরজাটা ফাঁকা করে সহাস্য মুখে সুহৃদবাবু বললেন।

- আসুন, আসুন। বাড়ির সবাই ভালো তো ?

- হ্যাঁ, ঠিকই আছি দুজনে। গত মাসে ছেলে এসে ঘুরে গেল। ভালই আছে ওরা।

এই দুলালের মাকে দেখানোর জন্য আপনাকে ফোন করেছিলাম। দেখুন ওনার জন্য কি করা যায়?

আমার সহকারী ভদ্রমহিলাকে বসিয়ে দিল আমার সামনে রাখা চোখ দেখার যন্ত্রে। পরীক্ষা করে বললাম, 'দুচোখেই ছানি পড়েছে, বয়সে যা হয় আর কি। এক এক করে অপারেশন করতে হবে, বাম চোখটা আগে।

-বেশ, ব্যবস্থা করে দিন।

-অবশ্যই হবে। কিন্তু এই গরমে কষ্ট করে আপনি এতদূর আসতে গেলেন কেন? দুলাল এসে দেখা করলেই তো হয়ে যেত।

-অচেনা জায়গায় প্রথম দিন সবারই একটু অসুবিধা হয়ে থাকে। এই চিনিয়ে দিলাম, এবার দুলাল মাকে নিয়ে নিজেই চলে আসবে।

আমার সহকর্মী দুলালের মাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। এই অবসরে সুহৃদবাবু দুলালের পরিচয় দিলেন।

- ও আমার পাড়ার রিক্সাচালক, তার চেয়েও বড় কথা দুলাল আমাদের বড় সহায়। কয়েকমাস আগে আমি বাজার করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যাই। ও আমাকে তুলে নিয়ে কাছের নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিয়ে বলে, 'আপনারা চিকিৎসা শুরু করুন, আমি বাড়ীর লোককে খবর দিচ্ছি।' সে যাত্রায় ওর জন্য বেঁচে যাই।

- এবারে বুঝলাম আপনি কেন নিজে এসেছেন। আপনাকে যতটুকু চিনি তাতে এটাই স্বাভাবিক।

অনেক বছর আগের কথা। তখন আমরা সপরিবারে চৈতন্যপুরে থাকতাম। সেদিন হাসপাতালে কাজ তখন প্রায় শেষের দিকে, - বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলল। আমি পুবের ওয়ার্ড থেকে পশ্চিমে অফিসের দিকে আসছিলাম। একটা অন্যরকম গানের সুর কানে ভেসে এল। কোথা থেকে আসছে? এ তো রেকর্ড নয়, খালি গলায় কেউ গাইছে। গানটা তো অফিসের উপরে আমার আবাস থেকেই আসছে। শুভ্রা তো হায়দ্রাবাদে, মায়ের গলাও তো এরকম নয়। তবে কে? "হৃদয় আমার প্রকাশ হল অন্ত আকাশে' আহা! কলেজে পড়ার সময় পঁচিশে বৈশাখে একবার জোড়াসাঁকোয় মেনকা

ঠাকুরের কণ্ঠে এই গান শুনেছিলাম। সেই দিনটাকে মনে করিয়ে দিল যে।

দোতালায় উঠতেই মা পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'এ হল প্রতিমা, কলকাতা থেকে এসেছে, কাল ওর স্বামীর চোখ অপারেশন হবে।' নমস্কার বিনিময় করে এক কাপ চা খেয়ে আবার আমি ওয়ার্ডে রাউন্ড দিতে চলে গেলাম। বিশেষ ভাবে খোঁজ নিলাম প্রতিমা দেবীর স্বামীর ব্যাপারে। ওনার একটা চোখে দৃষ্টি ভালো নয় - উন্নতির সম্ভাবনাও নেই, তাই যে চোখটা অপারেশন হবে সেটাই ভরসা। ভদ্রলোক খুবই শান্ত প্রকৃতির, মনে হল গভীর কোন চিন্তায় মগ্ন। আমিও মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম। বাড়ি ফিরে দেখলাম দুই ভদ্রমহিলা বেশ গল্পগুজব করছেন - যেহেতু প্রথম পরিচয় তাই আমার আলাপচারিতা সীমিতই রইল।

রাতে একসাথেই মেঝেতে বসে তিনজনে ভাত খেলাম। বিশেষ কোন আয়োজন নয়। ঘরে যা ছিল তাই ভাগ করে খাওয়া। প্রতিমা দেবী সলজ্জ ভাবে বললেন, চিকিৎসা করাতে এসে ডাক্তারের বাড়ি থাকা-খাওয়া, এতো উপরি পাওনা।

- ভালই তো, আমরা অতিথি পেলাম।

- সে আপনি যা বলবেন বলুন, কিন্তু আমি কি এমনটা হবে ভাবতে পেরেছিলাম? ভদ্রমহিলা ঘুমাতে যাবার পর মায়ের কাছে যা শুনলাম তাও আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

স্বামীকে ভর্তি করে দেবার পর উনি কিছুতেই সাধারণ যাত্রী নিবাসে একা থাকতে পারছিলেন না। আমাদেরই এক কর্মী ওনাকে সঙ্গ দেবার জন্য ঘুরতে ঘুরতে আমার মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। কথায় কথায় উঠে আসে এক বিপর্যয়ের কাহিনী। সদ্য ওনারা নিজেদের কন্যাকে হারিয়েছেন, এখনও শোক সামলে উঠতে পারেন নি। স্বামীর চোখের দৃষ্টি এতটাই কমে এসেছিল যে অপারেশন না করলে নয়, তাই হাসপাতালে আসতে হয়েছে। ওর মনের অবস্থা জেনে মা বলেছিলেন, 'থেকে যাওনা আমাদের বাড়ি – এখানে ঘরের অভাব নেই।' সন্ধ্যাবেলা অনেক গান শুনিয়েছেন উনি - খুবই দরদী কণ্ঠ। বলেছিলেন, "আগে রবীন্দ্রনাথের - গান অর্থের গভীরে গিয়ে গাইতাম না, দিদি। এখন জীবন দিয়ে তার সত্য উপলব্ধি করি।'

পরদিন প্রতিমাদেবীর স্বামী সুহৃদবাবুর অপারেশন, অনেক দায়িত্ব আমার উপর। বিশেষকরে গতরাতে ওদের জীবনকথা জানার পর আমি আরও বেশী সাবধানী হয়ে গেছিলাম। সবার সহযোগিতায় অস্ত্রোপচার নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। দিনের কাজের শেষে ব্যান্ডেজ খুলে দেখলাম চোখ ভালোই আছে। সবার কাছেই এটা বড় স্বস্তির খবর। সুহৃদবাবু শুধু আমার হাতটা ধরে একটু হাসলেন। সেদিন সন্ধ্যায় প্রতিমাদেবীর সাথে একটু গল্প হল। এখন স্বাভাবিক ভাবেই উনি একটু মন খুলে কথা বলতে পারছেন। বললাম, পরের দিন সকালে দেখে ছুটি দিয়ে দেব।

সপ্তাহখানেক পর সুহৃয়বাবু পরিকল্পনামত আবার দেখাতে এলেন। স্বচ্ছন্দে চলতে পারছেন দেখে খুব আনন্দ হলো। কুশল বিনিময়ের পর চিকিৎসার কাজ সারলাম। প্রেসক্রিপশনটা দিয়ে বললাম, আবার মাসখানেক বাদে দেখিয়ে যাবেন, আশাকরি এর মধ্যে আর কিছু সমস্যা হবে না, হলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন।

- আমি এখন নিজের কাজকর্ম শুরু করতে পারি?

- নিশ্চয়ই পারেন। বিশেষ কি করতে চান?

- কম্প্যুটর? চোখের ক্ষতি হবে না তো?

- নিশ্চিন্তে করুন, আলো অসহ্য হলে আমাকে জানাবেন।

একমাস পর যথারীতি আবার দেখা।

- ভালো আছেন তো ?

- অনেক ভালো, ডাক্তার বাবু। বই পড়তে পারছি এটাই আমার কাছে জীবন ফেরত পাওয়ার মতন। লিপিকা আবার পড়ে ফেললাম, গল্পগুচ্ছ নূতন করে শুরু করেছি।

- বসুন, চোখটা দেখি।

- সে হবে। আমার এই উপহারটা গ্রহন করলে খুব খুশি হব। তিনটে গানের সিডি আছে। দৃষ্টিটা ফিরে আসতে অবসর সময়ে বসে বসে আমার পছন্দমত সংকলনটা তৈরী করেছি। জানিনা আপনার পছন্দ কতটা মিলবে।

- অবাক কান্ড! আমার জন্য ঠিক এই উপহারটা বাছলেন কি করে?

- বলব?

- হ্যাঁ বলুন।

- আমার অপারেশনের সময় আপনি গুন গুন করে গান গাইছিলেন। ওটা আমাকেও কতটা শান্তি দিয়েছে জানেন না।

- আমি কিন্তু গায়ক নই, লজ্জা পেয়ে গেলাম। কোনদিন গানের চর্চা করিনি।

- তাতে কি আছে? গান তো মনের থেকে সৃষ্টি হয় মনের জন্য। আপনি না বললেও আমার মনে হয় আপনার যথেষ্ট গান শোনার অভ্যাস আছে।

- তা আছে। তবে বেশীরভাগই রবীন্দ্রসঙ্গীত।

- ভাল খুঁটি ধরেছেন।

সুহৃদবাবু হেসে বিদায় নিলেন।

আমার তো আর তর সইছে না; দেখি কি কি গানের সম্ভার আছে তিনটে সিডিতে। সন্ধ্যাবেলা আগ্রহ নিয়ে ল্যাপটপটা খুলে বসলাম। প্রচুর গান, সবই তো আমার প্রিয় শিল্পীদের খুব পছন্দের সৃষ্টি, রেকর্ডারে বেশীরভাগই রবীন্দ্রনাথের গান, কিছু আছে অতুলপ্রসাদী। বেশ কিছু স্বল্প পরিচিত গানও আছে - কতদিন পর এগুলো শোনার

সুযোগ পেলাম। কিন্তু সুহৃদবাবুর সংকলন আর আমার পছন্দ কিভাবে যে এতটা মিলে গেল সেই রহস্য তো কিছুতেই কাটছে না। কৌতুহল আর চাপা যাচ্ছেনা, ফোন করেই ফেলি।

- হ্যালো।

- গান শোনার সময় হয়েছিল ?

- হয়েছিল মানে? একটা প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না, তাই ফোন করলাম।

- এমন কি জিজ্ঞাসা?

- আমার পছন্দ আপনার সাথে কি করে এভাবে মিলে গেল?

- তাহলে আমার আন্দাজ ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছি।

- সেই অমূল্য আন্দাজটা কি করে হল? এটাই তো বিস্ময়।

- কি বলি বলুন তো? বলেই দিই।

- হ্যাঁ বলুন, অপেক্ষা সইছে না। আপনার গান শুনে মনে হয়েছিল আপনি সুবিনয় রায়ের গান পছন্দ করেন। আমিও ওনার খুব ভক্ত, তাই কাজটা সহজ হয়ে গেল, নিজের পছন্দে মিলিয়ে দিলাম।

- এ তো নমস্য সমঝদার গোয়েন্দা! খুব হাসলাম।

- আর আমার আনন্দটা শুনুন। যখন চিন্তা-দুশ্চিন্তায় ডুবে আছি তখন আমার এক মনের সঙ্গী পেয়ে গেলাম। রবি ঠাকুর কোথায় নিয়ে চলে গেল। - আপনি আমাকে এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার স্বাদ দিলেন।

- ঘটক কিন্তু রবীন্দ্রনাথ।

অন্তত একদশক কেটে গেছে ইতিমধ্যে। বয়স সবারই বেড়েছে। তার সাথে আমার বেড়েছে কাজের ব্যস্ততা। নিজের মনের যত্ন যেন নিতে ভুলে গেছি - যে শখগুলো এককালে আদর করে লালন করেছি তারা কোথায় হারিয়ে গেছে মনে হয়। সুহৃদবাবুর সাথে বছরে - অন্তত: একবার দেখা সাক্ষাৎ হয়। চিকিৎসা ছাড়া দু চারটে মনের কথা বিনিময় হয়। মাঝে মাঝে সুরের উপহার এখনো পাই। দুলালের মাকে দেখিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় উনি একবার আবার আমার ঘরে ফেরৎ এলেন। প্রবীণ মানুষ, হয়তো আমাকে দেখে কিছু অন্যরকম মনে হয়েছে।

- ডাক্তারবাবু, এখনও গান শোনার অভ্যাস আছে তো?

- না, তেমন নেই। আছে বললে ভুল বলা হবে। সব চাপা পড়ে গেছে মনে হয়।

- সে কি! এ কেমন কথা?

- ইদানিং আমার কর্মক্ষেত্রে মনের সাথে বহু যুদ্ধ করতে হচ্ছে তাই শখের কথা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে।

- এমন ভাবতে নেই, রবীন্দ্রনাথ আছেন না। আমি আরও গানের সংগ্রহ দেব আপনাকে, সব বিরল কণ্ঠের সংকলন। ভাল থাকবেন।

সুহৃদবাবু চলে গেলেন, আমি মনে মনে নানান কথা ভাবতে লাগলাম। তাই তো, 'রবীন্দ্রনাথ আছেন না'। রবিঠাকুর চলে যান নি, ছুটি নিয়েছেন সাময়িক, ডাকলেই আবার আসবেন গানের সুরে জাগিয়ে তুলতে।

গৌরনদী

সকালের নির্ধারিত সময়েই লৌহ কপাটের সামনে পৌঁছে গেলাম। এই অতিউচ্চ পাঁচিলটার পাশ দিয়ে অসংখ্যবার যাতায়াত করেছি, কিন্তু প্রাচীরের অন্যদিকটা দেখবার কোন সুযোগ কখনো হয়নি। এবার এক সামাজিক কাজের সূত্র ধরে মহানগরের এক সংশোধনাগারে প্রবেশ ঘটল। আইন মানতে যা কিছু করণীয় সবই সম্পন্ন করতে হল, ভারী দরজাটা একজন ঠেলে দিতেই ভিতরে ঢুকে কয়েক পা হেঁটে জেলর সাহেবের অফিসে গিয়ে বসলাম।

উপস্থিত সবার সাথে সৌজন্য বিনিময় হতে হতেই চায়ের কাপ হাতে পৌছে গেল। জেলর সাহেব জানতে চাইলেন সংশোধনাগারের অধিবাসীদের চোখ পরীক্ষার আয়োজনটা কেমন করে করা হবে। এসেছি ছয় জনের একটা দল - এতে ডাক্তার দুজন, শুভ্রা ও আমি। বললাম, "আমাদের হলটা দেখিয়ে দিন, আমরাই ব্যবস্থা করে নেব।" চা শেষ করে ছেলেদের দল ভিতরে চলে গেল যন্ত্রপাতি সাজাতে, আমরা দুজন আরও কিছুক্ষণ বসে রইলাম। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সন্ন্যাসী মহারাজ পৌঁছে গেলেন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্য। উনি এখানে নিয়মিত আসেন, তাই সবার সাথে খুব সহজ পরিচিতি আছে দেখলাম। পরিচয় করিয়ে দিলেন এক মেধাবী ছাত্রের সাথে - এবছর সে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। মহারাজ ওর পড়াশনায় সাহায্য করেছিলেন। অনেকেই এসে ওনার কাছে তাদের মনের কথা বলে গেলেন।

সংশোধনাগারের ভিতরে দোতলায় একটা ছোট অডিটোরিয়াম আছে, সেখানেই এক দিকে চশমা পরীক্ষা আর মঞ্চের উপর চোখ দেখার আয়োজন হল। হলের দেওয়াল ধরে দুই পাশেই লম্বা সারি নানান বয়সের পুরুষ মানুষের। চক্ষু পরীক্ষা শিবির উদ্বোধনের পর অফিসাররা প্রায় সবাই যে যার কাজে চলে গেলেন। হলটা এখন আমাদের হাতে, দুজন সর্দার গোছের যুবক আমাদের মূল সাহায্যকারী। আমার সাথে যাকে দেওয়া হল তার নাম খোকন - বয়স তেত্রিশ - চৌত্রিশ হবে। পরনে লুঙ্গি আর একটা সাদা জামা। বেশ গুছিয়ে কাজ করার ক্ষমতা আছে ছেলেটার, কোন কিছু এলোমেলো হতে দিচ্ছে না।

- স্যার, প্রথমেই একটা সময়ের হিসাব আপনাকে বলে দেই। বারোটায় সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে, লাঞ্চে যাবে। এরপর আবার দেড়টায় দেখা যাবে। সাড়ে তিনটেয় আবার ছাড়তে হবে, তখন রোল কলের সময়। এর মধ্যেই আপনাদের সবার চোখ দেখে নিতে হবে।

- ঠিক আছে ভাই, আপনি এক এক করে সবাইকে ডেকে এই চেয়ারে বসান।

কত বিচিত্র মানুষ; যুবক ও মাঝ বয়সীর সংখ্যা বেশি হলেও কয়েকজন বৃদ্ধ ও সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণও রয়েছে এদের মধ্যে। খোকন প্রত্যেককেই নাম ধরে ডাকছে। কারও সাথে মশকরা করছে। কারও চোখের সমস্যা ও-ই আগে বলে দিচ্ছে। এ তো দেখছি সবার অভিভাবক।

- খোকন, তুমি সবার কি অসুবিধা জান কি করে? লোক তো নেহাত কম নয়।

- ও স্যার, এত দিন থাকতি থাকতি সব জেনি ফেলিছি। কোনডার কখন কি রোগ বাধে, সেই আমারেই তো হাসপাতালে নে যেতি হয়। সব চিনি, মুখ চোখ দেখলি বলতি পারি কে আন্ডার ট্রায়াল, কে কনভিকটেড।

বিভিন্ন গ্রাম, শহরে মানুষের মেলায় অসংখ্যাবার মিশে গেছি চোখ দেখার অছিলায়, এবারেও ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছি কিন্তু কোথায় যেন সাবলীলতায় আটকাচ্ছে; সব প্রশ্ন এখানে করা যায় না। কারা প্রাচীরের ভিতরে দুই হাতে হীরে-পান্না-চুনীর আংটি পরা মানুষ বা অভিজাত পরিবারের যুবক কিভাবে এল - সে ঔৎসুক্য নিবারণ করাই ভাল, স্থান-কাল-পাত্র এখানে একেবারেই ভিন্ন। তবুও কখনো কখনো মুখ ফস্কে স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। একটা ফুটফুটে ছেলেকে দেখে শুভ্রা প্রশ্ন করে ফেলে, "তুই এখানে?" অবলীলায় উত্তর দেয়,"আমার বাবার বিজনেস পার্টনার বাবাকে মারছিল, আমার পাল্টা মারে সে মারা যায়।" ওর সমবয়সী আর একজন, "প্রেমিকা বেইমানি করেছিল.....।" কয়েকজন আবার রাজবন্দি, তাদের কথা বার্তার ধরণই আলাদা। কিছু আছে সমুদ্রে ধরা পড়া ছেলে, ভিনদেশী - তাদের ছাড়াবার কেউ নেই। পরপর চোখ দেখা চলতে থাকে, মাঝে মধ্যে চায়ের কাপ জুটে যায়। মনের মধ্যে কৌতুহল বাড়তে থাকে খোকনের পরিচয় নিয়ে, পোষাক দেখেই বোঝা যায় ও সংশোধনাগারের কর্মী নয়, ইউনিফর্মে না থাকলেও কর্মচারী হলে অন্ততঃ লুঙ্গির বদলে প্যান্ট পরা থাকত। কাজকর্ম, চালচলন কিন্তু অভিজ্ঞ অফিসারের মতনই। লাঞ্চের বিরতি ঘোষিত হল। "আপনারা খেয়ে নেন, আবার দেড়টায় দেখা হবে।" খোকন বলে চলে গেল।

সংশোধনাগারের কর্মীরাই আমাদের খাবারের প্যাকেট সাজিয়ে দিলেন। খেতে খেতে এখানকার মানুষদের সম্পর্কেই কথা হতে থাকল। নিজেদেরই ঘরের কাকা-মামা-ভাই-ভাইপোদের অন্য পরিবেশে দেখা। সকালেই সন্ন্যাসী মহারাজ বলেছিলেন, "এদের প্রায় সবই ভাল মনের মানুষ, কোন বিশেষ পরিস্থিতি জীবনে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিয়েছে।" খোকনের পরিচয় নিয়ে আমার কৌতুহল প্রথম থেকেই ছিল, তাই একজন সরকারী কর্মীকে জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম ওর বিষয়ে।

- খোকন বহুদিন আছে, দশ বছরের বেশী হবে। বুদ্ধি আছে, অলস নয়, তাই অফিসাররা অনেক কাজে ওকে লাগায়।

-তা কয়েক ঘন্টাতেই বুঝতে পেরেছি।

- না। ছেলেটা ভাল। লোকের উপকার করে।

দেড়টার পর আবার কাজ শুরু হলো। চলল বিকেল পর্যন্ত। এবার ফেরার পালা। আমাদের একটা ইচ্ছা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের বিখ্যাত নেতাবৃন্দ যেখানে কারারুদ্ধ ছিলেন সেগুলো একবার দর্শন করার। খোকনই আমাদের সবাইকে সেই সব স্মৃতিকক্ষ দেখাতে নিয়ে গেল। সবার শেষে দেখাল আমগাছের নীচে ফাঁসির মঞ্চ। এখানে নীরব হয়ে একটু দাঁড়াতেই হয়। কিছু বীর বিপ্লবীর নাম তো মনকে ছুঁয়ে যাবেই।

- খোকন ভাই, আমাদের কাছে কিছু চকোলেট আছে সবার জন্য, প্যাকেটটা কাকে দেব?

সমবেত ছেলের দল বলে ওঠে, 'ম্যাডাম, ম্যাডাম।'

খোকন বলে,"দিদিই সবার হাতে দিয়ে দিন। বোনের হাত থেকে কিছু নিতে ভাইদের সবসময়ই ভাল লাগে।"

জেলর সাহেব খবর পাঠালেন আমরা যেন ওনার অফিসে এক কাপ চা খেয়ে তবে যাই। একটু সময় পেয়ে খোকনের সাথে গল্প শুরু করলাম। এতক্ষণে কিছুটা বন্ধুত্ব তো হয়েই গেছে। ব্যাক্তিগত প্রশ্ন করাই যেতে পারে।

- খোকন তোমার বাড়ী কোথায়?

- যেখানে আমারে দেখতিছেন সেখানেই।

- তাই হয় না কি? আপত্তি না থাকলে বললে খুশি হব।

- বরিশাল।

- ও তুমি বাংলাদেশের। আমাদেরও পূর্ব পুরুষের দেশ বরিশাল। কিন্তু তোমার কথা যে একেবারে চব্বিশ পরগনার সীমান্ত অঞ্চলের। কেউ তোমার কথায় বরিশালের টান পাবে না।

- কত বছর হয়ে গেল। যাদের সাথে সারাদিন সারারাত কাটাই তাদের মতই ভাষা হয়ে গেছে।

- বরিশালের কোথায়?

- গৌরনদী।

- ঐ বরিশাল থেকে ভাঙ্গা হয়ে ঢাকা আসার রাস্তায় পড়ে? কয়েকবার স্টীমারে পদ্মা পার হবার জন্য ঐ রাস্তা দিয়ে এসেছি। বাটাজোর, মাহিলারা এইসব জায়গা পড়ে না ঐ রাস্তায়? গৈলাও তো গৌর নদীর কাছাকাছি, তাই না?

খোকন নির্বিকার। কোন উচ্ছাস নেই। ওর জন্মভূমিকে দেখেছে বিদেশে এরকম কাউকে কাছে পেয়েও মনের বহিপ্রকাশ কিছুই নেই। ওর ভাবলেশহীন নীরব মুখটাকে দেখলে মনে হয় গলায় যেন কিছু আটকে আছে। কথা আছে, আবেগ আছে - বেরোতে পারছে না, আত্মগ্লানি আর দুঃখ তাদের চেপে রেখেছে।

- দেশের কথা মনে করে কি হবে, ডাক্তারবাবু? এদেশে বেড়াতে এসেছিলাম, সোনারপুরে চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে মারতে একটা ছেলে আমার মায়ের নামে বিশ্রী গালাগালি করে; রাগের চোটে তার কানের গোড়ায় এমন থাপ্পড় মেরেছিলাম যে ছেলেটা মারা যায়। তারপর এখানেই এত বছর কেটে গেল। সেই মা-ই তো মাটিতে চলে গেছে, আর কার কাছে যাব?

- যখন পাঁচিলের বাইরে যাবে তখন দেশে ফেরত যেও।

- যে ভাগ্না-ভাগ্নীগুলোকে ঘাড়ে চড়িয়ে ঘুরেছি, নাকের শিকনি পরিস্কার করেছি তারা কি আর চিনতে পারবে? চিনলেও ঘেন্না করতে পারে। ভারী হয়ে আসে খোকনের কণ্ঠস্বর।

ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে, একটু প্রসঙ্গটা ঘোরানোর চেষ্টা করলাম।

- তোমাদের গৌরনদীর মিষ্টি খুব ভাল না? বরিশাল শহরে তো কতগুলো দোকান আছে গৌরনদী মিষ্টান্ন ভান্ডার বলে।

- খেয়েছেন গৌরনদীর মিষ্টি?

- নিশ্চয়। আমার চেহারাটার দিকে দেখ। দেখে বোঝা যায় না আমি খেতে ভালবাসি কি না? না খেয়ে কি আর ছেড়েছি? আমার বন্ধু নজরুল অন্ততঃ দুটো দোকানে খাইয়েছে।

- তাইলে বলেন তো, গৌরনদীর কোন মিষ্টি সবচেয়ে বিখ্যাত? খোকন হেসে ফেলে।

- দই, তাই না ?

- ঠিক বলেছেন। যত বাস ঐ রাস্তা দিয়ে যায় গৌরনদীতে বেশী সময় দাঁড়ায় যাতে লোকে মিষ্টি কিনতে পারে। এখন রাস্তাঘাট কেমন হয়েছে কে জানে?

- এখন খুব সুন্দর রাস্তা। পদ্মা নদীর উপর ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, বরিশাল-ঢাকা যাতায়াতের সময় কত কমে যাবে।

- তাই না? সব বদলে যায়, আমারও তো কত বদল হয়ে গেল।

- সব বদলালেও তোমার গৌরনদীতো থাকবেই।

ছলছল চোখে খোকন আমার হাতটা চেপে ধরে বলে কতদিন পর চেনা নাম শোনালেন - 'গৌর নদী'।

গৌরের প্রেমের নদী ফল্গু ধারার মত বয়ে চলে জন্মভূমির গভীরে।

হাতঘড়ি

"ডাক্তারবাবু একটু মাস্টারমশাইকে তাড়াতাড়ি দেখে দিন না। অনেকক্ষণ বসে আছেন।'- এক প্রৌঢ়ার কাছ থেকে অনুরোধ এলো।

নিশ্চয়, দেখছি। আমার সহকারীকে বলতেই রোগীর কার্ডটা বের করে দিল। শ্রী সুনীল কুমার বাগ, সদ্য শিক্ষকতা থেকে অবসর নেওয়া এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। যিনি মাস্টারমশায়ের জন্য অনুরোধ করেছিলেন তিনি ওনার স্ত্রী শ্রীমতী হেনা রানি বাগ। স্বামীর চিকিৎসা নিয়ে স্ত্রীর দুশ্চিন্তা থাকা স্বাভাবিক - হেনা দেবীও তার ব্যাতিক্রম নন। সুনীলবাবুর ক্ষেত্রে সেটি আরও বেশী সঙ্গত, কারণ তার চোখের সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী, যাকে আমরা 'ক্রনিক' বলে থাকি।

এই রকম মানুষের ক্ষেত্রে তার রোগ সম্পর্কে বোঝাতে গেলে অতি সুচিন্তিতভাবে শব্দচয়ন করতে হয়। মনে যাতে কোন রকম নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে সেই বিষয়ে সতর্ক থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। মাস্টারমশাই এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে রোগের বাইরেও বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কথাবার্তা সবসময়ই হয়, এবারও হল। সুনীল বাবুর সবচেয়ে বেশী কষ্ট সূক্ষ্ম লেখা না পড়তে পারার। আমাকে ওনার হাতঘড়িটা দেখিয়ে বললেন, "ডাক্তারবাবু ডায়ালের ভিতরে দেখুন; হাতের লেখা টা আমার নিজের। এখন লেখা তো দূরের কথা, ভালকরে পড়তেও পারি না।" "হাতের লেখা? বিশ্বাসই হয় না।" আমি বললাম।

আমার টেবিলে রাখা লেন্সটা দিয়ে লেখাগুলো বড় করে দেখলাম সেখানে কোন দামী ব্র্যান্ডের নাম নেই। সুক্ষ্ম নিপুন হাতে লেখা "HENA"। আমার সমস্ত আকর্ষণ তখন ঘড়ির ঐ লেখাটায়। ওনার স্ত্রীর নামটাই তো তাই - অদ্ভূত রোমান্টিকতা! জিজ্ঞাসা করলাম,"কত বছরের পুরনো এই ঘড়ি?" উত্তর এলো অন্তত তিরিশ বছর।

কথোপকথনে যে সময়টার কথা বলছি তখন দম দেওয়া ঘড়ি বাজার থেকে অপসৃত হতে শুরু করেছে। আমার নিজের ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে গেল। রোজ সকাল ৭টায় বাবা বাড়ীর সবার ঘড়িতে দম দিয়ে দিতেন। কোন বিরল কারণে সেই অভ্যাসে কোন দিন ছেদ পড়লে কারও কারও ট্রেন ফেল হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। সুনীলবাবু নিয়মিত ঘড়িটির যত্ন করে তিরিশ বছরেও সম্পূর্ণ সচল রেখেছেন। যে সুইশ কোম্পানী এই ঘড়িটি তৈরী করেছিল কৃতিত্ব তার নয় – কৃতিত্ব ঘড়িটার প্রদত্ত ব্র্যান্ড নেম - "HENA"র।

মানুষের ভালবাসার রূপ কত রকমেরই না হয়। "ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে'- ঘড়ির লেখাটা তো তারই বহিঃপ্রকাশ।

ইতস্তত না করে প্রশ্ন করেই ফেললাম, "ইতিহাসটা একটু জানতে পারি কি?''

হেনাদেবী একটু লাজুক হাসি হেসে স্বামীর দিকে তাকিয়ে যেন সম্মতি চাইলেন, "বলি?" সুনীল বাবুও মুচকি হেসে দিলেন, যেন "কি আর করা যাবে? বলে ফেলো।"

ভদ্রমহিলা উৎসাহভরে কয়েক যুগ পিছনে চলে যান। "একবার অনেক বছর পর মাস্টারদের মাইনে বাড়লো। বেড়েছে শুনিছিলাম, কিন্তু বকেয়া টাকাটা যে পেয়ে গেছে সেটা আমকে লুকিয়েছিলো। দেখি ইস্কুল থেকে একদিন ছুটি নিয়ে সকালবেলা কলকাতা দৌড়াল, বলে দরকারি কাজ আছে। আমিও আর জানতে চাইনি কি সেটা। বিকেলে ফিরে এসেই চা-টিফিন খেয়ে আবার বেরিয়ে গেলো। কি এত জরুরি কাজ? জানতে চাইলে বলে, "বুঝবে না"।

সন্ধ্যার দিকে ঘরে এসে বলে হাত পাতো। পাতলুম, নতুন ঘড়ির বাক্সটা আমাকে দিয়ে বলে পরিয়ে দাও আমার হাতে। এবার একবার ভাল করে দেখো। দেখি ইংরাজিতে আমার নাম লেখা, এবার বুঝলাম - বন্ধুর ঘড়ির দোকানে বসে লিখে এনেচে। চোখে জল চলে এলো। ওর মুক্তোর মতন হাতের লেখা বলে কত লোক কত শৌখিন জিনিসে নাম লিখিয়ে নিতো, কিন্তু আমার জন্য যে ও মনে মনে অন্য ফন্দি ভেবে রেখেছে তা কে জানতো?

সুনীলবাবুকে বছরে অন্তত দুইবার চিকিৎসার জন্য আসতে হত। কোন দিন উনি একা আসেন নি, সঙ্গে দুই হেনা - একজন সাথে, একজন হাতে। ওষুধ লিখে দিই আর প্রত্যেকবারই ঘড়িটার দিকে উৎসাহ ভরে তাকাই - যত্নের কি অসাধারণ এক নিদর্শন। হেনা দেবীও প্রত্যেকবার স্বামীর সাথে চোখ দেখিয়ে নেন। ওনার সমস্যা বিশেষ বড় কিছু নয়।

বয়স দুজনেরই বেড়েছে তাই আজকাল আর দুজনে খুব নিয়মিত আসতে পারেন না। হেনা দেবী মোটামুটি সচল হলেও মাস্টারমশাই এর শরীরটা বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। সম্প্রতি দুইবার ভদ্রমহিলা একাই এসেছিলেন। স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করতে জানলাম স্ট্রোক হবার পর উনি শয্যাশায়ী, বাম দিকে শরীরের জোরটা কমে গেছে। আমি বললাম নিয়মিত ওষুধ চালিয়ে যেতে যদি না ও আসতে পারেন। এইভাবেই একে একে আমার বয়স্ক বন্ধুরা সব সরে যায়। স্বাভাবিক, মেনে নিতেই হয়।

গতকাল সকালে হঠাৎ দেখি যুগলে উপস্থিত আমার হাসপাতালে। মনে বেশ আনন্দ পেলাম। আমার সহকারীকে বললাম সবার আগে ওনাদের দেখানোর ব্যবস্থা করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে প্রবেশ করলেন আমার ঘরে। এযাবৎ কোনদিন এঁদের হাত ধরাধরি করে ঢুকতে দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম সুনীলবাবুর ডান হাতে লাঠি - করধৃত কম্পিত শোভিত দন্ড। বাম হাতটা ধরে আছেন হেনা। শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে দেখলাম সেই হাতঘড়িটা টিক টিক করে চলছে বাম কব্জিতে হেনার ধরে থাকা

আঙুলগুলোর ঠিক পাশে। ঘড়িটার ঔজ্জ্বল্য আজও অমলিন। সুনীলবাবুকে ধরে নিয়ে চেয়ারে বসাতে বসাতে মনে মনে প্রার্থনা করলাম "HENA ঘড়ির কাঁটা যেন এমনই সচল থাকে।"

হয়তো বা

"রাজাবাজার ট্রাম ডিপুউউ" - উচ্চকণ্ঠে হাঁক ছেড়ে কন্ডাক্টর বাসের দেওয়ালে একটা থাপ্পড় মারল। আমি আসন ছেড়ে গেটের দিকে এগোতে থাকলাম। সামনেই শিয়ালদা স্টেশনে নামতে হবে। ভীড় বাসে সবসময় জায়গা পাওয়া যায় না। বসলে তবু কোথায় এলাম জানলা দিয়ে দেখা যায়। দাঁড়িয়ে থাকলে বাস কতদূর পৌঁছালো তা জানার জন্যে কন্ডাক্টর বা সহিসের চিৎকারই একমাত্র ভরসা।

কলকাতার কলেজে নূতন ভর্তি হয়েছি তখনও কোনও হস্টেলে একটা চৌকি জোটেনি। তাই - রোজ বাড়ি থেকে ট্রেনে দেড় দেড় তিন ঘন্টা যাতায়াত করতে হয়। কলেজে আসার সময় দমদম বা উল্টোডাঙ্গায় নামা চলে, কিন্তু ফেরার বেলা শিয়ালদা থেকে ট্রেন না ধরলে বসা তো দূরের কথা সিটের কাছাকাছি পৌঁছানোও সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বনগাঁ লোকালের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। শ্যামবাজার থেকে শিয়ালদা যখন আসি তখন প্রথম প্রথম খুবই উৎকণ্ঠা থাকত, ঠিক জায়গায় নামতে পারব তো? বেশ কিছুদিন যাবার পর ফুটপাথে একটা নিশানা চিহ্নিত করে ফেললাম। একটা ছোট পাকুড় গাছের নীচে কাঠের গুমটিতে ঠেস দিয়ে বেশ কিছু পরিত্যক্ত মাটির প্রতিমা থাকত। এককালে কত মাইক বাজিয়ে এদের পূজা অর্চনা হয়েছে, এখন তারা গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছেন। কারও মুকুট উড়ে গেছে, কারও মাটি গলে গিয়ে বাঁশের কাঠামো মাত্র অবশিষ্ট - কি ঠাকুর ছিল তা আর বোঝার উপায় নেই। ভীড় ঠাসা বাসে মানুষের ফাঁক দিয়ে এসব ঠাকুর দেবতাদের দেখতে পেলেই বুঝতাম এবার ঠেলেঠুলে এগেতে হবে শিয়ালদা স্টেশনে নামার জন্য। ফস্কে গেলেই একেবারে ফ্লাইওভারের ওপারে প্রাচী সিনেমায় নামতে হবে- একটা ট্রেন মিস।

এই দেবদেবীর বৃদ্ধাশ্রমটাই আমার নিত্যযাত্রার ল্যান্ডমার্ক হয়ে উঠল। কিছুদিন পর আবিষ্কার করলাম ঠাকুর দেবতার সঙ্গে একজন মানুষও ওখানে বাস করে। শীর্ণকায়া মাঝবয়সী এক মহিলা বেশীরভাগ সময়ই শুয়ে থাকে তার সমস্ত রং-রূপ রাস্তার কালো ধুলো ঢেকে দিয়েছে। মেয়েমানুষ তো, গয়না একটু যেন থাকতেই হয়; আছেও হাতে দুগাছা চুড়ি অ্যালুমিনিয়মের - সোনালী রঙের প্রলেপ কবে ঘুচে গেছে। চুড়িগুলো একা নয়, সাথে শাঁখা আর পলাও রয়েছে; কেউ কখনো ক্ষণিকের জন্য হলেও মানুষটাকে ভালোবেসেছিল - তারই আভাস। পাগলীটা কখনও বসে বসে হাসে, কখনো ঘুমায় হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে। অধিকাংশ সময় মৌলালির দিকেই পা দুটো থাকে তাই ডান হাতটা বেশী চোখে পড়ে। মাটির মূর্তির সাথে এই মানবী প্রতিমাও কালক্রমে আমার কাছে স্থান নির্দেশক চিহ্ন হয়ে উঠল।

কয়েক মাস যাতায়াতের পর ছাত্রাবাসে একটা আসন জুটে গেল। রোজের বদলে এখন সপ্তাহান্তে বাড়ি যাতায়াত করি। পথ এখন অনেক চেনা হয়ে গেছে, তাই কোথায় নামতে হবে সেই উৎকণ্ঠা আর নেই। শিয়ালদাতে বাস থেকে নামার পর তবুও অভ্যাসবশতঃ পাকুড় গাছটার দিকে তাকাই। ঠাকুর দেবতা আরও কিছু নূতন জুটেছে - কারও রং আছে, কারও ধুয়ে গেছে। আজকাল পাগলীটাকে আর দেখিনা ওখানে, বেশ কয়েকমাস হয়ে গেল। আবার কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কে জানে?

ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের আড্ডা হয় ক্যান্টিনে, ওখানে ভীড়ে জায়গা না হলে কর্মী আবাসের গলিতে চায়ের ঠেকে, যার আদরের নাম 'ফাইভস্টার'। কিছু দিনের মধ্যেই আর একটা নিরিবিলি জায়গা আমাদের জামায়েতের ঠিকানা হয়ে উঠল - সেটা অ্যানাটমি ডিসেকশন হল। শতাব্দী প্রাচীন খালপাড়ের মেডিক্যাল কলেজের শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে বেশ বড় বড় শ্বেত পাথরের টেবিল আর বর্মাটিকের চেয়ার ছিল। ডিসেকশন হলের ফর্মালিনের গন্ধ সহ্য করতে পারলে এ এক অন্যরকম আরামের জায়গা। উঁচু ছাদ থেকে লম্বা লম্বা লোহার দন্ডে সিলিং ফ্যান ঝুলছে, অন্য ঘরগুলোর থেকে এখানে গরম কিছুটা কম। প্রথম যেদিন অ্যানাটমি বিভাগে গিয়েছিলাম সেদিন ভয় নয়, কেমন একটা অনভ্যস্ততার অস্বস্তি ডিসেকশন হলে ঢুকতে বাধা দিয়েছিল। মৃত মানুষের চর্বি যখন বাধ্য হয়ে হাতে লাগাতেই হল তখন অপরিচিত জগত থেকে পরিচিত গন্ডিতে অনায়াসে ঢুকে গেলাম। আমাদের গ্রুপের যে কজন উৎসাহ নিয়ে শব ব্যবচ্ছেদ করতাম তাদের কাছে ডিসেকশন হলটা খুব প্রিয় হয়ে উঠল। তখন গ্লাভস পরা বারণ ছিল, তাই ডিসেকশন শেষ করে বেশ খানিকক্ষন কার্বলিক সাবান ঘষতে হত হাতের চর্বি ছাড়াতে। তাতে কি যায় আসে? সানন্দে আমরা ওখানে খাওয়া দাওয়াও সারতাম। এর ওর বাড়ি থেকে বয়ে আনা টিফিনের ভাগাভাগি মড়া কাটার সাথে সাথেই চলত। যার হাতে ছুরি-কাঁচি তাকে অন্য কেউ খাইয়ে দিত - নারকেল নাড়ু, পরোটার টুকরো, সিঙ্গাড়ার ভগ্নাংশ আরো কত কি।

একদিনের ডিসেকশন ক্লাস আটটা টেবিলে মানুষের দেহ শোয়ানো আছে, কোনটা আস্ত, কোনটা খন্ডিত। আজ ব্যবচ্ছেদ করার কথা স্বপন আর আমার। দুপুরের বিরতির পর ক্লাস - দুজনেই সাদা অ্যাপ্রন পরে তৈরি। আমাদের টেবিলে এক মহিলার নিথর দেহ। হঠাৎ কেন যেন আনমনা হয়ে গেলাম।

– স্বপন, আজ ডিসেকশন করব না রে। সুধাংশু, তুই নাম না।

- কেন পার্টনার, কি হলো? শরীর খারাপ লাগছে?

- ইচ্ছে করছে না রে আজ।

সেদিন আর মন বসলো না পড়াশুনায়। অন্য মনস্কতায় নার্ভ, মাসল, আর্টারি কিছুই চেনা হলো না। কলেজ সেরে হেঁটে হেঁটে দত্তবাগানের হস্টেলে ফেরার সময় সঞ্জয়

বলল, “আজ তোর হঠাৎ কি হলো রে? ডিসেকশন করলি না?”

- মহিলাকে লক্ষ্য করছিলি? আমি বললাম।

- কি এমন ছিল দেখার মতন?

- আমি বারবার ডান হাতটা দেখছিলাম।

- হাত হাত? কই, আমার তো কিছু মনে হয়নি।

- হাতের বিবর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের চুড়ি গাছা, শাঁখা, পলা - ওই গয়নাগুলো আমার খুব চেনা চেনা লাগছিল রে।

জন্মদিন

সব জন্মদিন সমান হয় না। সুকন্যার আজ মন খারাপ। একমাত্র সন্তান তিতলির বার্থ ডে কোন অনুষ্ঠান বিনা এবার পালিত হবে সেটা কখনোই কল্পনা করতে পারে নি। পাঁচ বছরে পড়বে, কত শখ অপূর্ণ থেকে গেল। হঠাৎই গোটা পৃথিবী আতঙ্কের জালে বন্দী। লকডাউনে রাস্তার বিশ্রাম মিলেছে; ফাঁকা সড়ক এখন অ্যাম্বুল্যান্সের দখলে। ওদের সাইরেনের শব্দ মানুষের মনে নানান দার্শনিক চিন্তার তরঙ্গ তুলে দেয়। শহরের বহুতলের বারান্দায় বসে যাদের এতকাল রাস্তার দিকে তাকিয়ে সময় কাটানোর অভ্যাস ছিল তাদের এখন মনে হয় আবাসনের পিছন দিকের ফ্ল্যাট হলে বরং ভাল ছিল, এই গাড়িগুলো দেখতে হতো না ।

ঋষির এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম চলছে। হঠাৎ ইন্টারনেটের চাহিদা বেড়ে গেল বহুগুন। আবাসনে সবাই খোঁজ নেয় কাদের সার্ভিস ভাল। বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ, পাছে রোগের আমদানি হয়। অনেক কষ্টে কেবল অপারেটরকে ধরে নেট ঠিক করার পর খানিক স্বস্তি পেল ঋষি।

এতক্ষণ সুকন্যা সুযোগই পায়নি ঋষিকে কিছু বলার। এবার ইতস্তত করে অনুরোধ করে,

- দেখ না, কোথাও কেকের দোকান যদি খোলা থাকে।

- শুধুমাত্র কাঁচা বাজার আর মুদির দোকান তো কয়েক ঘণ্টার জন্য খুলতে দিচ্ছে। কেক কি পাওয়া যাবে? মিষ্টির দোকানও তো সব বন্ধ, কেক তো তারও পরে।

- তবুও দেখ না, যদি কোথাও একটু ঝাঁপ খোলা থাকে।

- বেলা হয়ে গেছে, সম্ভাবনা কম। বলছ যখন দেখি। নাহলে আমাদের চিরন্তন পায়েস তো আছেই।

ঋষি ভাবতে থাকে কিভাবে পুলিশের শাসন এড়িয়ে বড় রাস্তায় যাওয়া যায়। গলির মধ্যে কোন কেকের দোকান নেই। একটা বুদ্ধি মাথায় আসে, স্টেট ব্যাঙ্কের পাসবই হাতে নিলে হয় না? ব্যাঙ্কে যাবার অনুমতি তো আছে। দোকান গুলো তো ঐ দিকেই। ব্যাঙ্কের কাজ বললে পুলিশ ছেড়ে দেবে। ঋষি সন্তর্পনে এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়। না, কোথাও পরিচিত কেকের দোকান একটাও খোলা নেই। মাথার উপর জৈষ্ঠ মাসের প্রখর রোদ্দুর তাই বেশি দূর আর হাঁটা চলে না। এবার ফিরতে হয়। সেলুনের দিকে চোখ পড়ে; সেখানেও দরজা বন্ধ। লোকে এখন বাড়ি বসেই যেমন পারে চুল ছাঁটছে। পার্লারটা ডান হাতে রেখে ঋষি গলির মধ্যে এগিয়ে চলে। কিছুই মিলল না, খালি হাত – বাস্তবকে মানতেই হবে। হঠাৎই গলির বাঁকের মুখে সামনে এসে

দাঁড়ায় এক যুবক। ভ্যান রিকশার সিটে বসে হাঁফাচ্ছে আর গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে। ঋষি দেখে দাঁড়িয়ে যায়।

- দাদা, হিমসাগর আম নেবেন? ভাল মিষ্টি আছে।

- নিতে পারি, কিন্তু তুমি এরকম হাঁফাচ্ছ কেন?

- পুলিশের তাড়া খেইছি, দাদা। এই গলির ভিতর একটু আবডাল আছে, তাই পালিয়ে এলাম।

ঋষি আম বাছতে থাকে, রোদের তাপে ফলগুলো আর তাজা নেই, তবুও খারাপ নয়। কতই বা বয়স হবে ছেলেটার? বড়জোর কুড়ি। কত কঠিন জীবন সংগ্রাম এই বয়সেই! একবারও দরাদরির কথা মনে হয় নি ঋষির। সসম্মানে ফলের দাম মিটিয়ে হাতে ব্যাগটা তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। এক পা গিয়েই পিছন ফিরে তাকাতে হল ফলওয়ালার ডাকে।

- দাদা, তোমার বাড়িতে কি কোন ছোট বাচ্চা আছে?

- হ্যাঁ আছে, কেন গো?

- তারে এই দুটো জামরুল খেতি দিও, পয়সা লাগবে না। সাদা ফল দুটো ডান হাতের মুঠোয় নিয়ে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ঋষি। চশমাটা খুলে চোখের কোনা মুছে নিয়ে এগিয়ে চলে ঘরের দিকে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা

কোলাখামে পৌঁছাতে বেশ বেলা হয়ে গেল। কালিম্পং থেকে রাস্তাটা নেহাত কম নয়, শেষ অংশে নাওড়া ভ্যালির ঘন জঙ্গলে গাড়ি তো চলতেই চায় না। রিসর্ট ম্যানেজার অধিকারীবাবুর ফোন ইতিমধ্যে দু-তিন বার পেয়েছি - উনি অপেক্ষা করে ছিলেন আমাদের জন্য। উঠোনে গাড়ি দাঁড়াতেই বললেন,"তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিং হলে চলে আসুন, খাবার তৈরি। মালপত্র আমি পৌঁছে দিচ্ছি।"

বাম দিকে তাকিয়েই দেখি নীল আকাশের গায়ে কাঞ্চানজঙ্ঘা সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। কদিন ধরে এই রূপটা দেখার জন্যেই তো পাহাড়ের বাঁকে বাকে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম, কিন্তু প্রকৃতি তেমন সহায় হয়নি - মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু আধটু দর্শন দিয়ে ছেলে ভুলিয়ে রেখেছিল।

"ওয়েদার ভাল চলছে, আরও দেখতে পাবেন। বেলা অনেক হলো, আগে খেয়ে নিন।" অধিকারী সাহেবের কথায় সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যাই।

খাবার শেষে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে বাম দিক থেকে পড়ন্ত রোদের রূপটা উপভোগ করতে থাকি। সামনের দুটো গাছে দৃষ্টিটা একটু আটকে যাচ্ছিল; সেটা বুঝতে পেরেই ম্যানেজার বাবু হেঁকে বলেন, "আর একটু হেঁটে উপরে আমার ঘরের সামনে চলে আসুন, ভাল ভিউ পাবেন।"

সত্যিই তাই - যত সময় এগোচ্ছে তত যেন রং আর রূপ বদলাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার। আকাশ ক্রমশঃ লাল হতে থাকে, রাতুল আভা ছুঁয়ে যায় তুষারশৃঙ্গকে - শুভ্র থেকে লোহিত বর্ণে পৌঁছে আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় সে। চারিদিক ঘিরে ধরে সন্ধ্যা। অদ্ভুত নিস্তব্ধতার মাঝে প্রাণের স্পন্দন বাঁচিয়ে রাখে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ।

"রাতের খাবার কিন্তু আমরা সাড়ে আটটার মধ্যে শেষ করে দেই। তাড়াতাড়ি শোবেন। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে সাড়ে চারটায় উঠবেন। সূর্য উঠবে সকাল পাঁচটা দশে কিন্তু তার আগে থেকে আকাশটা না দেখলে অনেক কিছু হারাবেন" – অধিকারীবাবু পরামর্শ দেন। বয়স্ক মানুষটা কেমন সবকিছুর খেয়াল রাখছেন। কদিন ধরে দিগন্ত পানে চেয়ে চেয়ে তো শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা খুঁজে যাচ্ছি। আজই প্রথম তার পূর্ণ দর্শন পেলাম। কাল আশা করি প্রকৃতি বিমুখ করবে না - ভোরে উঠতে তো হবেই।

রাতের আঁধার কাটছে, আকাশে গোলাপি আভা। ক্যামেরা হাতে নিয়ে ম্যানেজারের নির্বাচিত স্থানে তৈরি থাকলাম। ডিজিটাল ক্যামেরার অসংখ্য ছবি তোলা যায়, গতরাতে ব্যাটারিতে চার্জও দেওয়া আছে। ছবি তুলেই যাচ্ছি, থামতে পারছি কই? যে দৃশ্যপটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি তাকে বিরাট, বিপুল, বিশাল কোন বিশেষণে ধরব? তোলা ফটোর

দিকে তাকিয়ে মন ভরে না; এ তো যা দেখছি তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও নয়। রূপের ছবি তোলা যায় কিন্তু তার মাধুরী অধরাই থাকে। হঠাৎ তুষার শৃঙ্গের পূর্ব দিকটা লাল আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল - প্রথম আলো, আহা! অবিকল কপালে আঁকা সিঁদুরের টিপের মতন। এ দৃশ্যের স্থায়িত্ব বড় ক্ষণিকের, ক্রমে পুরো পর্বতমালা কমলাবর্ণ ধারণ করে - এর পর সোনালি হলুদ, অবশেষে শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে রঙের খেলা সমাপন হয়। সৌন্দর্য্য বিতরণে প্রকৃতি এখানে অকৃপন, জগতের সব চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রূপের সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

এবারে চায়ের আয়োজন চলতে পারে। পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মনে হল কোন স্বপ্ন শেষে যেন বাস্তাবের জগতে নেমে এলাম। এর পরের পর্ব কাছাকাছি একটু ঘুরে বেড়ানো, ছবি তোলা, ধীরে-সুস্থে প্রাতরাশ, আবার বারন্দায় বসে প্রকৃতি উপভোগ করা।

একটা বেজে গেছে, খাবার ঘরে যাবার পালা এবার। ঘরে টিভি নেই, চতুর্দিকে মনুষ্য সৃষ্ট কোন শব্দের উৎপাত নেই, কাজের থেকে ছুটি নেওয়া আছে - এর থেকে মধ্যাহ্ন ভোজনের আর কি নিশ্চিন্ত আয়োজন হতে পারে? আমাদের পারিবারের জন্য নির্দিষ্ট টেবিলে বসলাম। আমরাই প্রথম পৌঁছেছি। পরের টেবিলেই আসবেন দুই-দুই চারজন বরিষ্ঠ নাগরিক - একদিনের আলাপে ওনাদের যতটা দেখেছি তাতে বয়স হলেও, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বলা যাবে না কিছুতেই। সন্তানরা বিদেশে থাকে, নিজেরা কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছেন, ভ্রমন আর আড্ডাতেই নিজেদের সতেজ রেখেছেন।

খাবার একের পর এক টেবিলে আসতে লাগল। বাসন্তী পোলাও, শুকনো শুকনো মাংসের পদ আরও কত কিছু।

"ছোট বাটিতে সাদা ওটা কি?" – শুভ্রা জিজ্ঞাসা করে।

"পোস্ত বাটা, ম্যাডাম।' পিছন থেকে শ্যামলদার গলা। তরুনদাকে দেখিয়ে বলেন, "সৌজন্য এই মহাশয়ের; ম্যানেজারকে বলে রাজি করিয়েছেন।" "জঙ্গলের মধ্যে দুগ্গা ঠাকুরের দর্শন না হলেও আজ অষ্টমীর দিন বাঙালির পোস্ত দর্শন তো হোক অন্ততঃ।" তরুনবাবু বলেন।

-মুখে পড়লে তো মনে হবে একদিন বাঙালি ছিলাম রে, আমরা আবার বর্ধমানের মানুষ।

তবে তো আপনারা পোস্টমাস্টার - পোস্ত খাইবার মাস্টার, কিছু একটা সমাস হবে।

- তা পোস্তর আবার ঘটি-বাঙাল কি আছে? পোস্ত ভালবাসে না এমন তো কাউকে দেখলাম না আজও।

- মুরগির মাংসটাতে একটা শাকের মত কিছু দিয়েছে। খেতে তো খাসা লাগছে।

মেথি শাকও মনে হচ্ছে না, তাহলে কি ? রান্নাঘরে যার হাতে এই অষ্টমীর ভোগ রূপ পেয়েছে সেই পাচক কৃষ্ণ ঘুরে ঘুরে সব তদারক করছিল, তাকেই জিজ্ঞাসা করা হল। উত্তর এল, সর্ষে শাক। বাহ্, এক নতুন পদ খাওয়া হল।

কৃষ্ণ দেখতে বেশ। পাহাড়ি যুবক - পরনে কালো টি শার্ট এবং হাফপ্যান্ট, পিছনে চুলটা ঝুঁটি বাঁধা। গতকাল রাত্রে যখন অসাধারন ভাপা মোমো খাইয়েছিল তখন চেহারাটা যথার্থ মিলে গিয়েছিল। আজ যখন জিভে জল আনা বঙ্গমঙ্গল (বাঙালি ও মোগলাই) খাবার রেধে খাওয়ালো তখন ওকে ঠিক ঠাকুর বা বাবুর্চি ভাবতে পারছিলাম না। "নাই বা হলো ধুতি-গামছা পরা তেলচিটে পৈতেধারী রাঁধুনি বামুন বা ফেজ টুপি ওয়ালা ওস্তাদ; কেমন সুন্দর আতিথেয়তা করছে দেখুন। টেবিলে ঘুরে ঘুরে জানতে চাইছে কার কি লাগবে," সুমিতাদি বললেন।

- সত্যিই তাই।এই সাধারণ মানুষগুলো সারা পৃথিবীতে একই রকম। মনে পড়ে ক্যামেরুণের কথা। ফ্রেঞ্চ বলা পশ্চিম আফ্রিকার দেশটায় ইংরাজিতে ভাব বিনিময় করতে পারতাম গুটি কয়েক লোকের সঙ্গে। ইয়ায়ুন্ডে সেন্ট্রাল হসপিটালে কিছু মানুষের চোখের অপরেশন করা হয়েছিল। মানুষগুলোর বর্ণ আলাদা, পোষাক আমাদের ধারে কাছে নয়, ভাষা বুঝি না, মাথার চুলও আলাদা। তবুও গলা জড়িয়ে ধরে ছেলেকে বলে, "নে, ডাক্তারের সাথে আমার ছবি তোল।" চোখের চাহনি, মুখের ভাষা আর হাতের ইঙ্গিতে কথা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। ফিরে আসার দিন সকালে দেখি এক বৃদ্ধ হাতে নীল সাদা থলে নিয়ে কাউকে খুঁজছেন। চোখে কাল চশমা নিয়ে মিস্টার পাস্কাল এনগোমো যে আমাকেই চাইছেন তা বুঝিনি প্রথমে। আমার হাতে ফল ভর্তি ব্যাগটা তুলে দিয়ে বললেন,"মেসি(ধন্যবাদ) ডক্টর, ক্যামেরুণ অরেঞ্জ।" ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা আর আশীর্বাদ যেন একটি বাক্যে সব এক হয়ে গেল। লেবুগুলো কলকাতায় বয়ে এনেছিলেম মনে হয়েছিল এই ফলের মহিমা - পূজার প্রসাদের থেকেও অনেক বেশী।

সুমিতাদি কথার পৃষ্ঠে কথা তুললেন, তরুনদাকে মনে করিয়ে দিলেন কঙ্গোর স্মৃতি। "হ্যাঁ, কঙ্গোতে কিছুদিন কাজ করে ফেরার পর কলকাতায় বেশ কদিন রাত্রে অজানা নম্বর থেকে ইন্টারন্যাশনাল কল আসত। অচেনা নম্বর বলে সাবধানতা বশতঃ ফোন ধরতাম না। কয়েকদিন একই নম্বর থেকে ফোন আসতে থাকায় একদিন সাহস করে ধরেই ফেললাম। অবাক কান্ড! ফোনের ওদিকে এডসন, আমার কঙ্গো অবস্থান কালের ড্রাইভার। ফোনের একটাই কারণ; আমি চলে আসার পর ওর খুব মন খারাপ, নাকি কাজে যেতে ভাল লাগে না, তাই আমার সাথে একটু কথা বলতে চায়। কি কান্না ছেলের! বলে 'নিয়ে যাবে আমাকে তোমাদের দেশে?' যেন পাঁচ বছরের শিশু বাবার কাছে আব্দার করছে।"

গল্পে গল্পে হাতের এঁটো শুকিয়ে গেছে, এবার একে একে হাত ধুতে হয়। আমি

বেসিন থেকে ঘুরে এসে বললাম, "দেখুন, ভাল খাবার তো খেলামই তার সাথে কত ভাল মানুষের কথা বললাম আমরা। মনটা বেশ সতেজ লাগছে, তাই না?"

"সত্যিই তাই, নির্ভেজাল আনন্দের আড্ডা।" শুভ্রা বলে। হাত ধুতে গিয়ে দেখলাম কোনার টেবিলে অল্পবয়সি ছেলেটা শুধু ডাল আর আলু সেদ্ধ দিয়ে ভাত খাচ্ছে অন্যদের লোভনীয় খাবারের সামনে বসে বসে। দুদিন পেটটা গোলমাল করেছে, তাই এই দশা। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আদর করে সেটাই খাওয়াচ্ছে তাকে, ছেলেটাও মনের আনন্দে তৃপ্তি ভরে উদর পূর্তি করছে - কোন আফসোসের চিহ্ন মাত্র নেই। বলছে, "খাবারে কি আসে যায়? এসেছি তো মন ভরে দেখতে। "

শ্যামলদা এতক্ষণ গল্প শুনে যাচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে সরস মন্তব্য জুড়ে আমাদের আনন্দ দিচ্ছিলেন। এবারে বললেন, "কেন আমরা সবাই ভাল আছি জানেন? শুভ্রা, বাঁ হাত দিয়ে জানলার পর্দটা সরাও তো, কারণটা দেখতে পাবে।"

পর্দা সরতেই দেখা গেল মধ্যাহ্নের সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে তুষার কীরিট কাঞ্চনজঙ্ঘা চোখের দুয়ার পেরিয়ে যার অবস্থান এখন হৃদয় মাঝারে।

কলকাতা

কয়েক বছর আগের কথা - সন্ধ্যার কাছাকাছি কলকাতা থেকে বিমানে ভোপাল পৌঁছালাম। আষাঢ় মাস, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। হাতে আমার একটা মাত্র চাকালাগানো সুটকেস; বাইরে এসে নিজের নামের প্ল্যাকার্ড খুঁজতে লাগলাম। হাততুলে ইঙ্গিত করতেই এক দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ আমার দিকে এসে সালাম জানালেন। পরণে কুর্তা পাজামা, মাথায় টুপি, মুখে অল্প দাড়ি - আচার ব্যবহারে পরম্পরাগত মুসলিম ভদ্রতা।

"স্যর, কৃপয়া য়ঁহা রুকিয়ে। বারিষ হো রহা হ্যায়, বাহার মত যাও। ম্যায় গাড়ি ইধারই লে আউঙ্গা।" বর্ষা বেশি নয়, ইলশেগুড়ি বলা চলে। আমি ওর সাথে হাটতে চাইলাম কিন্তু কিছুতেই রাজী হলেন না। ছোট একটা সাদা গাড়ি কিছুক্ষণ পর এসে দাঁড়াল। স্যুটকেস চলে গেল যথাস্থানে। পিছনের দরজা খুলে আমার সারথি আমাকে বসতে আহ্বান করলেন। আমি গেটটা বন্ধ করে নিজেই সামনের দরজা খুলে চালকের পাশে বসলাম। এটা আমার প্রিয় অভ্যাস, বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যায়। জায়গাটা সম্পর্কেও পরিচয় মেলে। বৃদ্ধ খুব খুশিই হলেন - মনে মনে হয়তো এমনটাই চাইছিলেন।

রাজা ভোজ এয়ারপোর্টের পাঁচিলটাও ছাড়াতে পারিনি ড্রাইভার সাহেব শুদ্ধ বাংলায় প্রশ্ন করলেন, "আপনি নিশ্চয় বাঙালি?"

-অবশ্যই। কিন্তু আপনার পরিচয়? এত ভাল বাংলা বলেন কি করে?

-কলকাতায় ছিলুম তো। আমার নাম লাল বাহাদুর গুরুং।

-তার মানে আপনি নেপালি, আমি ভেবেছিলাম আপনি ভোপালের মুসলমান। হেসে বললেন, "অনেকেই এই কথা বলে। নেপালিরা আমার মতন লম্বা কম হয় তো।" ভদ্রলোক অনর্গল বাংলা বলে চলেছেন, অবশ্যই হিন্দী টান আছে, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে ভালবেসে বাংলা বলতে চাইছেন। এদিকে আমার কৌতুহল ক্রমশঃ বাড়ছে ওনার সম্পর্কে জানতে

-কোথায় থাকতেন কলকাতায় ?

-ধরমতল্লা ইস্টীটে কমলালয় বলে একটা বড় দোকান ছিল, তার পিছনে মোটর পার্টসের দোকানে কাজ করতাম।

-আপনার বাড়ি কোথায় স্যার?

-ই. এম. বাইপাসে রুবি হাসপাতালের কাছে।

-চিনিনা বাবু, কোন দিকে?

- কসবা ছাড়িয়ে।

-বালিগঞ্জের রেল ফাটকের ওপারেই তো কসবার বস্তি ছিল, রিফ্যুজি কলোনি।

ওখান থেকে আমাদের দোকানে দুজন ইস্টাফ আসতো। তারপর তো মাছের ভেড়ি, ধাপার মাঠ - এর বেশি জানি না। অনেক বছর তো হয়ে গেল কলকাতা ছেড়ে ভোপাল এসেছি।

-হ্যাঁ, এইসব নূতন এলাকা আপনার চেনার কথা নয়।

-স্যার, ট্রাম চলে এখনো?

-চলে, কিন্তু অনেক রুট উঠে গেছে।

-শিয়ালদা স্টেশনের সামনে ট্রাম ডিপু ছিল। ওখান থেকে হাবড়া, ডালহৌসি ট্রাম চলতো। চৌদা(১৪) নম্বর ট্রামে আমরা কখনো কখনো ভোরবেলা গঙ্গাস্নানে যেতাম।

-এখন আর ট্রাম হাওড়া যায় না, লালজি। শিয়ালদার ট্রামগুমটিও কবে উঠে গেছে। ওখানে এখন বিশাল পার্কিং এলাকা, ফ্লাইওভার।

-ওহ্। কলকাতা কত বদলে গেল। ওখানে তো পাতাল রেলও হয়ে গেছে শুনেছি।

এরপর উঠে এল হাতিবাগান আর ধর্মতলার সিনেমা পাড়ার কথা । সেখানেও দুঃখের খবর। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী হলগুলো সবই প্রায় দেহ রেখেছে। লালজি বলে ওঠেন, -"কি বলছেন, মেট্রোও নেই? ধরমতল্লা চিনব কি করে ? আমিও তো কত বুড়া হয়ে গেলাম, তাই না?"

কথায় কথায় গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। হোটেলের রিসেপশানে আমাকে ছেড়ে দিয়ে লাল বাহাদুর তখনকার মতন দায়িত্ব সমাপন করলেন।

বেশ আনন্দে কাটল আধঘন্টা, রেশটা চলল আরও বহু সময় ধরে। লালজীর কথাগুলো আমাকে দুজন বিদেশীর কথা মনে করিয়ে দিল। ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলিতে এক সভায় একজন কানাডিয়ান বৃদ্ধ আমাকে চমকে দিয়ে বললেন,"আমি কিন্তু এবার কলকাতার সবচেয়ে বড় দুর্গা দেখে এসেছি।"

-তার মানে, আপনি?

-হ্যাঁ বাংলা জানি। তা বলে আমাকে কিন্তু দাদু বা কাকু বলবে না, ডাকবে অ্যালানদা বলে। ভদ্রলোক আমার সামনেই অন্যদের কলকাতার বিশেষত্ব বর্নণা করতে গিয়ে বললেন,"লোকেরা যে এত প্রাণোচ্ছল কি বলব! একবার কলেজস্ট্রীটের এক ডাবওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জল মিষ্টি হবে তো?" উত্তরে বলল, 'কি করে বুঝব বলুন? আমি তো আর ভিতরে ডুব দিইনি।' Such is the sense of humour of a common man.

আর একবার আলাপ হয়েছিল আমেরিকার মুনসন দম্পতির সাথে। তখন তাদের বয়স নব্বই এর আশেপাশে। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ওরা কলকাতায় ছিলেন এবং ধর্মতলার এক চার্চে ওদের শুভ পরিণয় ঘটে। পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকী উদ্যাপন করতে ওরা মিশিগান থেকে কলকাতাতেই উড়ে এসেছিলেন। ওই গির্জার সিঁড়িতে একই

জায়গায় ছাতা হাতে একই ভঙ্গিতে তুলিয়েছিলেন যুগলের ছবি। আমাকে কলকাতার লোক পেয়ে মেরী খুব খুশি; আলাদা করে আমার সাথে গল্প করতে লাগলেন।

- কি সুন্দর ছিল আমাদের কলকাতার দিনগুলো। Most interesting was the riverside. আমরা স্ট্রান্ডে ঘোড়ার গাড়ি চড়তাম, ফ্রেড নৌকার ছবি তুলতে ভালবাসত। একটা সুন্দর ফুলের বাজার ছিল নদীর পাড়ে। শুধু ফুল দেখতেই কতবার গেছি।

- কিন্তু আমার ধারনা, যদিও ঐ সময় আমি জন্মাই নি, পঞ্চাশের দশক তো বাংলার জীবনে সংকটের সময়। সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে, হাজার হাজার শরনার্থী শিয়ালদা স্টেশনে বসে। রাস্তায় বুভুক্ষু মানুষের ভিড় - এই রকমই তো বাবা মায়ের কাছে শুনেছি।

- হ্যাঁ, লোকের কষ্ট খুবই ছিল। রাস্তায় মিছিল, প্রতিবাদ লেগেই থাকত। কিন্তু প্রতিটা জমায়েতে বাঙালীরা কি সুন্দর গান গাইতো ভাবা যায় না। আমার এক বান্ধবী গানগুলোর আনুবাদ আমাকে শোনাত। কি সমৃদ্ধ ভাষা। Tagore had a great influence on them. কলকাতায় ছিলাম বলেই টেগোরকে জেনেছি। অভাব থাকলেও উৎসবে লোকের উৎসাহের ঘাটতি ছিল না। Really, people of Bengal were incredible.

পরের দিন সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিলাম বিদিশা জেলার আনন্দপুর গ্রামে যাবার জন্য। সেখানে কয়েকটা জায়গায় কাজের উপলক্ষ্যে ঘুরতে হবে। একটা বড় গাড়ি এসেছে আমাকে নিতে, এবার সূরজ আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাবে। প্রথমে আমি উঠব আর অন্য তিনজনকে বাড়ি থেকে তোলা হবে। সবাই উঠে পড়তেই মিসেস মাথুর, যিনি সবকিছু আয়োজনের দায়িত্বে, আমাকে প্রশ্ন করলেন, "How was your journey yesterday ?"

- ওহ্, অসাধারন!

- Is it? What was special about it?

আপনি একজন দারুণ ভদ্রলোককে আমাকে আনতে এয়ারপোর্ট

পাঠিয়েছিলেন। অনেক ধন্যবাদ।

- কে গেছিলেন? নাম মনে আছে?

বিলক্ষণ, ওনার নাম বললেন লাল বাহাদুর গুরুং।

- Lal Bahadur? Then you must be a very very important guest, Dr. Sil.

- কেন? এতে বড় ব্যাপার কি আছে?

মিসেস মাথুর সূরজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "লাল বাহাদুর কি এখনও গাড়ি চালান?"

"হাঁ। কভি কভি উনকা মন করতা হ্যায় তো গাড়ি লেকে খুদ চলা যাতা হ্যায়।" সূরজ বলল।

আমি বিষয়টা বুঝে উঠতে পারছি না। জিজ্ঞাসা করলাম, "উনি কি বিশেষ কেউ?"

- বিশেষ মানে? বড় ট্রানসপোর্ট কোম্পানির মালিক উনি। ওর কাছ থেকেই আমরা গাড়ি নেই। বিদেশী টুরিস্টদের ভাড়ায় গাড়ি দেওয়া ওনার ব্যবসা। ভদ্রলোকের গতকালের চেহারা আর কথাবার্তার সাথে যেন একটা ধনী ব্যবসায়ীর প্রত্যাশিত রূপ কিছুতেই মেলাতে পারছি না।

ভোপাল থেকে ঘন্টাখানেক যাবার পরই বিপত্তি শুরু হলো। ছোট ছোট পাহাড়ী নদীগুলো বর্ষার জলে খরস্রোতা হয়ে উঠেছে। অন্য সময় জলই থাকে না, অনায়াসে নদীর উপর বানানো রাস্তা দিয়ে ছোট, মাঝারি, বড় সব গাড়িই চলে যায়। এখন তাদের কি রুদ্র মূর্তি, ধাক্কা দিয়ে গাড়ি উল্টে দিতে পারে। প্রথম রাস্তাটায় ঝুঁকি নেওয়া হলো না। আরও দুটো জায়গাতেও নদী পার হবার চেষ্টা করা হলো, তাতেও বিপদ। অগত্যা অনেক ঘুরে একটা বড় ব্রিজ দিয়েই নদী পার হওয়া গেল। সমস্ত কাজের পরিকল্পনা গেল বদলে, সাথে সাথে বাড়তে লাগল ক্লান্তি আর বিরক্তি। বিকেলের দিকে একটা ধাবায় তড়কা রুটি দিয়ে পেট ভরিয়ে ভাবলাম আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো পৌঁছে যাব।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; আবার সামনে এল এক ভয়ংকর তেজে বেয়ে চলা নদী। বিকল্প রাস্তা খোঁজার চেষ্টা না করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম -আর পারা যাচ্ছে না আজ রাতটা ফরেস্ট বাংলোতেই কাটাবো । জানা গেল হ্যারিকেনের আলো, রুটি আর সবজি পাওয়া যাবে। তবুও সূরজ অনেকক্ষণ ধরে নদীটাকে পর্যবেক্ষন করে বলল, "জলের তোড় কমে গেছে, ভয় পাবেন না। আমি ঠিক পার করে নেব।" কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ভার অন্যের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। এবারেও সূরজের ভরসায় রাত হলেও গন্তব্যে পৌঁছাতে পারলাম। আড়াই ঘন্টার পথ তেরো ঘন্টায় শেষ হল। এরপর দুদিন ছেলেটাই আমাদের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেল। আমরাও আমাদের পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করলাম।

ফেরার সময় অসুবিধা বিশেষ হয় নি। বৃষ্টিটাও দুদিন বন্ধ থাকায় রাস্তার উপর দিয়ে আর জল বয়ে যাচ্ছিল না। বিস্তীর্ণ সোয়বিনের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে, সাঁচি স্তুপের পাশ ঘেঁষে সন্ধ্যা নাগাদ ভোপালে এসে পৌছালাম। পরদিন সকালে আবার কলকাতায় ফেরার বিমান ধরতে হবে। কথা হল সুরজই আমাকে এয়ারপোর্ট ছেড়ে দেবে। আমাকে নিজের ফোন নম্বরটা দিয়ে বললো, "আমি সময়মতই এসে যাব তবুও নম্বর থাক; যদি প্রয়োজন হয় কল করবেন। আজকেই হোটেলে বলে রাখবেন কাল যেন নাস্তা একটু আগে তৈরি করে দেয়।"

স্নান সেরে সকাল সকাল তৈরি হয়ে গেলাম। চেক আউট করে স্যুটকেসটা নিয়েই ব্রেকফাস্টে বসলাম। কর্নফ্লেক্সের বাটি থেকে এক চামচ মুখে তুলতে না তুলতেই শুনতে পেলাম, "নমস্কার স্যার। আস্তে আস্তে খান, সময় আছে। আপনার বাক্সটা দিন আমি গাড়িতে তুলে দেই।" একি! এতো সূরজ নয়। লাল বাহাদুর নিজেই এসেছেন যে। খাওয়া শেষ করে হোটেলের লবিতে এসে ওনাকে খুঁজতে লাগলাম। গাড়িটাতো দেখতে পাচ্ছি, সামনের দরজাও খোলা, কিন্তু লালজি কোথায়? দেখি ফুটপথে একটা উঁচু জায়গায় বসে ছোট নোটবুকে কিছু লিখছেন।

-খাওয়া ঠিক হলো তো? চলুন স্যার। অনেক আনন্দ আর শ্রদ্ধা নিয়ে গাড়ির সামনের আসনে বসলাম।

-আপনার কাজকর্ম সব ঠিকঠাক হয়েছে তো?

-হ্যাঁ, সূরজ খুব সাহায্য করেছে। ছেলেটার প্রশংসা করতেই হবে।

-ও খুব সৎ ছেলে। ট্যুরিস্টরা সবাই ওর তারিফ করে।

এবারে আমিই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গান্তরে গেলাম। -"লালজি, আমি কিন্তু আপনার পরিচয় পেয়ে গেছি।"

-কি পরিচয় পেলেন স্যার?

-আপনি এতবড় ব্যবসার মালিক কিন্তু অন্যকে বুঝতে দেন না।

-কি আর বড় হলাম স্যার? গরিব লোক, নেপালের গোর্খা জিল্লা থেকে কলকাতা এসেছিলাম। অনেক মেহনত করে জীবনে কিছু পেলাম আর কি। কত মেহমান আসে, ইচ্ছা হলেও তাদের ভাল করে খাতিরদারি করতে পারি না ভাষা জানিনা বলে। শুধু good morning আর thank you ছাড়া তো কিছুই ইংলিশ বলতে পারি না। চেষ্টা করি যাতে আমার লোকজন সবার খেয়াল রাখে।

তাহলে লাল বাহাদুরের একটাই অভাব - ইংরাজি না জানা, আর বাকিটা পূর্ণতা – সেটা তার অনাড়ম্বর, নিরহঙ্কার জীবন বোধে ।

-কিন্তু আপনি আমাকে নিতে এসেছিলেন কেন? সেটা একবার নয়, দুবার।

হেসে বললেন, "কলকাতার ফ্লাইট তো, প্যাসেন্জার লিস্ট দেখছিলাম। গেস্টের নাম দেখে মনে হল বাঙালি হবে নিশ্চয়। তাই নিজে চলে গেলাম। ভেবেছিলাম যদি ভাল লোক হয় তাহলে একটু কলকাতার গল্প করব। সেদিন কথা বলে খুব আনন্দ পেলাম তাই আজ আবার এসেছি। কলকাতার লোক না হলে ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগান ঝগড়া কে জানবে বলুন? এখনো হয়?"

-হয় মানে? তফাৎ একটাই - ঝগড়ার জায়গাটা এখন ময়দান ছেড়ে সল্টলেক স্টেডিয়াম চলে গেছে।

-আচ্ছা, পাটালি গুড় পাওয়া যায় এখনো শীতের সময়? ঐ গুড়ের সন্দেশ -

আহা!

-হয়। তবে আগের মতন অত ভালো গুড় আর নেই।

-কলকাতার মতন মিঠাই কোথাও মিলবে না। ভীম নাগ, পুঁটিরাম আছে তো এখনো?

-হ্যাঁ, হ্যাঁ ভালই আছে। আপনার মত কারো সাথে দেখা হবে জানলে আবশ্যই মিষ্টি নিয়ে তবে আসতাম।

এবার আমি প্রশ্ন করি, "আপনি ভোপাল আসার পর কতবার কলকাতা ফেরৎ গেছেন?'

-প্রথম দিকে দু তিন বার, তারপর আর না।

-আবার যেতে ইচ্ছা হয় না?

এবার লালজি যেন একটু আনমনা আর গম্ভীর হয়ে যান। "ফিরে গিয়ে কি দেখব স্যার? সুধীর, ভোলা, জগন্নাথ - ওদের কি আর খুঁজে পাব? যতদিন কলকাতায় ছিলাম, আমরা সব একসাথে মৌলালিতে থাকতাম। সবাই তখন বাচ্চা ছেলে - ঘর ছেড়ে দু পয়সা কামাই করতে বেরিয়েছি। জগা ভালো রান্না করতো। একসাথে সবাই নাইট শো সিনেমা দেখতাম। পরে কাম ধান্ধায় কে কোথায় হারিয়ে গেলাম। তখন তো আর ফোন ছিল না, আর আমরা অঙ্গুঠা- ছাপ লোক, চিঠি কি করে লিখব? শেষ যে বার কলকাতা গেছিলাম বন্ধুদের দেখা পাইনি। তাই আর যাইনা। গেলে মনে কষ্ট পাব।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লাল বাহাদুর বলে ওঠেন, "দোস্ত কে বিনা দুনিয়া কুছ ভী নহী হ্যায়।" এই একবারই হিন্দীতে প্রকাশ করলেন তার আবেগ। "তবুও ইচ্ছা হয় ছেড়ে আসা কলকাতার কথা শুনতে। তাই আপনার কাছে এলাম।"

এয়ারপোর্ট এসে গেল। হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় নিলাম। পিছনে ফিরে দেখি বৃদ্ধ তখনো দাঁড়িয়ে; ওর ভালবাসা ভরা চোখ যেন বলছে, "ভাল থেকো কলকাতা।"

পাদুকাগণিত

শ্রাবন সন্ধ্যা - রোমান্টিক না ছাই, বিরক্তির একশেষ! সূর্যের আলোর শেষ আভাটুকু মিলিয়ে গেল, অন্ধকার নামতেই শুরু হল মশার আক্রমন। পুরী যাবার ট্রেন ধরব বলে মেচেদা স্টেশনে বৌ-বাচ্চা সহ অপেক্ষা করতে করতে ঘোষনা হল, "অমুক গামী, তমুক আপ শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেস আজ পাঁচ ঘন্টা দেরিতে আসবে।" অতঃপর ? অতঃপর আর কি ? বিভিন্ন উপায়ে মনের রাগ, দুঃখ, বিরক্তি প্রকাশ করে চলা আর আত্মরক্ষার্থে মশা মারা। কি কুক্ষণে যে দুজনে ঠিক করেছিলাম, "বিবাহ বার্ষিকী এবার পুরীতে কাটালে কেমন হয়?" ছেলেটাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে হাঁটলাম বেশ কিছুক্ষণ, অনেক ট্রেন দেখালাম - সব কটাই সময়ে ছুটছে, শুধু আমরা যেটাতে যাব সেই গাড়িটাই অসম্ভব লেট। সবই প্রভুর ইচ্ছা। হলদিয়াবাসী আমরা - পুরী যাবার ঐ একটা ট্রেনই মেচেদায় দাঁড়ায়। যে খাবারটা জমিয়ে ট্রেনের কামরায় বসে খাব বলে বাড়ি থেকে সযতনে বয়ে এনেছিলাম সেটা স্যাঁতস্যাঁতে প্ল্যাটফর্মে বসেই খেতে হল। ছেলেটা কোলে মাথা রেখে ঘুমালো আর আমরা দুজনে গল্প করতে লাগলাম। সময় তো কাটতেই চায়না।

অপেক্ষার অবসান, রাত বারোটায় শ্রীজগন্নাথের আগমন ঘটল। ভাগ্য ভালো আমাদের নির্ধারিত কামরা খুঁজে পেতে খুব ছুটতে হয়নি। কনডাকটর সাহেব দরজাটাও খোলা রেখেছিলেন। A2 কোচে বার্থের কাছে পৌঁছালাম। যাত্রীরা সবাই প্রায় ঘুমন্ত, হাল্কা আলোয় আমাদের নির্ধারিত নীচের বার্থে দেখি অন্যজন টানটান হয়ে শুয়ে, উপরেরটা ফাঁকা।

আলোটা জ্বালতেই হল। মা গো! এ কি! লোকটা শুধু শুয়ে নেই; লালা ফেলে ভাসিয়েছে। মাথার কাছে গোটা দুই সিগারেট আর দেশলাই এর বাক্স ছাড়ানো। এত বিরক্তির পর বাচ্চাটাকে নিয়ে কোথায় শান্তিতে ঘুমাতে যাব- এ কি বিপত্তি! কনডাকটর সাহেব খুবই ভদ্র, কোচ অ্যাটেন্ড্যান্টকে ডেকে দুজনে মিলে মদ্যপ লোকটাকে সরিয়ে বার্থটাকে সাফ করে মা-বাচ্চার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। শুভ্রা বলল, "তুমি রাতে ঘুমাবে না, মাতালটা আবার আসবে। পুরী পৌছে সারা দিন ঘুমিও।"

ক্লান্ত আমিও - সারাদিনের কাজের শেষে হলদিয়া থেকে মেচেদা এসেছি, তারপর তো বিরক্তিকর প্রতীক্ষা। কিন্তু দুই চোখ যেন বুজে না আসে বা বুজলেও কান যেন সজাগ থাকে তার প্রাণপন চেষ্টা করতে থাকলাম। ট্রেন চলার বিচিত্র আওয়াজ উপভোগ করতে ভালই লাগে। চাকার ছন্দোময় শব্দের মাঝে মাঝে লাইন বদলের খটখট আওয়াজ বেশ বৈচিত্র্য এনে দেয়। শুয়ে শুয়ে আধো ঘুমে ট্রেনের চলার আওয়াজ যেন

মুক্তির বার্তা বহন করে - বেড়াতে যাচ্ছি এই কথাটা যেন কানে কানে বলে যায়। গাড়ি চলছে; আমি কখনো চোখ বুজছি, কখনো খুলে এপাশ ওপাশ দেখছি।

মাতালটা গেল কোথায় ? এই রকম একটা উজবুক কি করে জুটল ভগবান জানে। অ্যাই! আবার এল। কন্ডাকটর সাহেব ঠিক খেয়াল রাখছেন। অনেক বুঝিয়ে তাকে উপরের বার্থে তুলে দিলেন। সে কি আর সহজে ওঠে? প্রথমেই বায়না ধরে, "আমার জুতো কই? খুঁজে দাও।" কন্ডাকটর বলেন,"জুতোর দরকার নেই, অনেক রাত হয়েছে। তুমি কি জুতো পরে ঘুমাবে? উপরে উঠে অন্যদের শান্তি দাও।" মাতালকে উপরে ওঠার মই ধরিয়ে পিছনে ঠেলা মেরে উপরে তোলা সহজ মোটেই নয়। যেমন করে গরু ব্যবসায়ীরা ধাক্কা দিয়ে গরুকে ট্রাকে তোলে সেরকম ভাবেই কাজটা করতে হল।

আমি দেখে যাচ্ছি আর প্রাণপনে জেগে থাকার চেষ্টা করছি। আমার নীচের বার্থে একজন যুবক বেশ আরামে ঘুমাচ্ছেন, হলুদ টি-শার্ট পরা, ভুঁড়িটা বেরিয়ে আছে। আঙ্গুল-হাত-গলায় স্বর্ণলঙ্কারের প্রদর্শনী - দেখে ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। বেশ সুখী মানুষ - এতসব উৎপাতের তোয়াক্কা না করেই সুখনিদ্রায় মগ্ন।

কিছু পরে পরিবেশটা শান্ত হলো। মাথার উপরের মৃদু আলোটা ইচ্ছা করেই জ্বালিয়ে রাখলাম । মাতালচন্দ্র উপুড় হয়ে যোগনিদ্রায় মগ্ন আর আমি চিত হয়ে শোয়া নৈশ প্রহরী । ঘন্টা তিন - চার চলার পর কন্ডাকটর বাবু আমার সহযাত্রীকে এসে মৃদু ধাক্কা দিলেন অত্যন্ত ভদ্র ভাবে ওড়িয়া ভাষায় বলেলন, "ভদ্রক আসছে, উঠে পড়ুন।" গুনধর ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে বলল শুধু, "অঁ অঁ" এবার একটু জোরে ধাক্কা "ওঠ, ওঠ। ভদ্রকে ট্রেন বেশী সময় দাঁড়াবে না।" এবার উত্তর,"হুঁ, হুঁ, বুঝেছি।"

গাড়ীর চাকার আওয়াজ যখন জানান দিচ্ছে যে রেলগাড়ী থামতে চলেছে তখন কন্ডাকটর এসে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "শিগগির নামো, ট্রেন এক্ষুনি থামবে।"

এবার বাবুর ঘুম ভাঙল। চোখ গোল গোল করে কন্ডাকটরের দিকে তাকিয়ে রেগে বলল,"আমি নামব কি নামব না তুমি বলার কে হে ? তুমি কি সর্বোত্তম?" বলেই পাশ ফিরে ঘুমের তৃতীয় ইনিংস শুরু হল। হতাশ কালোকোট-বাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,"দেখুন, রাত জেগে ওরই উপকার করতে গেলাম আর কি উত্তর পেলাম। এবার যাক, কোথায় যাবে।" আমি ওনাকে ওনার ধৈর্য্যের বাহবা দিয়ে বললাম "কি আর করা যাবে ? আপনার সব চেষ্টাই তো আপনি করলেন।"

গাড়ি কটক পৌঁছানোর আগেই বেশ আলো ফুটেছে। মদ্যের সাথে সূর্যদেবের বোধ হয় একটা চুক্তি আছে, সূর্যাস্তের পরই মাতলামির মঞ্চাভিনয় শুরু হয় আর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে যাত্রাপালার শেষে জ্ঞানের উদয় হয়। লাটসাহেব উপরের বার্থ থেকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন গাড়ি কোথায়

পৌঁছেছে। ঝপাং করে নীচে নেমে নীচু হয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে বললেন, "মহানদী, কটক আসুচি।" প্রথমেই জুতোর খোঁজ - এক পাটিতো আছে, অন্যটা কোথায় ? অন্য যাত্রীদের সুটকেসের এপাশ ওপাশ, সামনে পিছনে খুঁজেও দ্বিতীয়টার হদিশ পাওয়া গেল না। এদিকে বোধহয় নিম্নচাপ তাড়া দিচ্ছিল তাই ডান পায়ের চটি পরেই মহাশয় শৌচাগার অভিমুখে রওনা দিলেন। একটা ছোট ব্যাগ উপরের বার্থেই রইল। শৌচ সমাপ্ত হবার আগেই ট্রেন কটক স্টেশন ছেড়ে গেল - অর্থাৎ গন্তব্য স্থল থেকে আরও দূরে চলে যাওয়া । এবারে বোধহয় একটু বোধদয় হয়েছে, হয়ত লজ্জাও লাগছে। তাই বার্থ থেকে ব্যাগটা কাধে নিয়ে সহযাত্রীদের মায়া ত্যাগ করে মদ্যপকুলপতি স্থান ত্যাগ করলেন।

কিন্তু গেল কোথায় ? কৌতুহল সামলাতে না পেরেই আমি একটু টয়লেটের দিকে গেলাম । গিয়ে দেখি একটা ছোট সিটে একাকি বসে আছে । আমাকে দেখেই অনেকটা মিস্টার বিনের মত সরল হাসি হেসে জুতা সহ ডান পাটা উঁচু করে বাংলায় বলে উঠল, "জুতা যতই দামি হোক একটা জুতার কোন দাম নাই।" এক পাটি জুতা হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা সচরাচর বিরল, কিন্তু এই ঘটনাও যে মূল্যবান দার্শনিক চিন্তার জন্ম দিতে পারে সে একমাত্র মদ্যের কল্যানে। কিছুক্ষণ পরেই ভুবনেশ্বর স্টেশন এলো। সঙ্গীহীন চপ্পলটিকে কামরাতেই পরিত্যাগ করে সর্বোত্তম মহোদয় ট্রেন থেকে নেমে দুলে দুলে নগ্নপদে হেঁটে ভুবনেশ্বরের ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন। আমরা ওর মহামূল্য মন্তব্য নিয়ে হাসাহাসি করলাম কিছু সময়।

কারও কারও দীর্ঘ ঘুম দেখলে ভারি তৃপ্তি হয় - যারা দেখে তাদের নিদ্রার ঘাটতি এতে কিছুটা পুষিয়ে যায়। এমনই এক সৌভাগ্যবান পুরুষ আমাদের হলুদ গেঞ্জি সহযাত্রী। উঠে থেকেই সেই দেখছি লম্বোদর হাফপ্যান্ট পরে জয়ঢাক অর্ধেক প্রকাশ করে একই মাত্রায় ঘুমিয়ে যাচ্ছেন। ট্রেনটা লেট হওয়াতে ও-ই বোধহয় সবচেয়ে লাভবান হয়েছে - ঘুমাবার দীর্ঘ অবসর পেয়েছে। নিদ্রার সবচেয়ে বড় শত্রু বোধহয় কিডনি । সেই ভূত দুটো একটু কম কাজ করলে আর তলপেটের চাপে ঘুম ভাঙার প্রশ্ন থাকে না । ভুবনেশ্বর ছাড়ার পর লম্বা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে খোকাবাবু উঠলেন। উঠেই গন্তব্য শৌচাগার, কিন্তু চপ্পল জোড়া কোথায় ? একটাই তো দেখা যাচ্ছে। মোটা মানুষটা ভরা তলপেট নিয়ে মাথা নীচু করে সিটের তলায় জুতো খুঁজতে থাকে। না, পাওয়া গেল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "উডল্যান্ডসের জুতো, কদিন আগে কিনেছি। বেশ দাম নিয়েছিল।" অগত্যা ব্যাগ থেকে উনি একজোড়া লাল হাওয়াই চটি বার করে বাথরুমের উদ্দেশ্যে চললেন ।

আমি বসলাম অঙ্ক করতে। দুজনেরই এক পাটি করে জুতো নেই; তাহলে হিসেবটা মেলে কি করে ? এরকমটাই হবে - মাতালচন্দ্রকে প্রথমবার ঘুম থেকে উঠিয়ে দেবার

পর কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল। তখন মনে হয় একপায়ে নিজের এক পাটি আর অন্যপায়ে সহযাত্রীর উসল্যান্ডস্ জুতোর আর এক পাটি গলিয়ে প্রস্থান করেছিল। ফিরে এসেছে খালি পায়ে। অতএব কামরায় পড়ে রইল দুটি ভিন্ন প্রকারের ডিভোর্স হয়ে যাওয়া চটি। অঙ্ক প্রায় মিলে গেছে। ব্যবসায়ী খোকাবাবু প্রাতঃকৃত্য সেরে ফিরে আসতেই আমি স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে ওনাকে আমার পাদুকাগণিত বর্ননা করলাম। মোটাভাই বেশ খুশী হলেন। কোচ অ্যাটেন্ডান্ট দুজনকে ডেকে বললেন ,"শোন, দাদা কি বলছেন।" আমি আবার আমার ক্যালকুলেশন বর্ননা করলাম। একজন বলে উঠল,"ওহ! মাতালটাতো রাত্রে A1 কোচের মাঝেতে কিছুক্ষণ শুয়ে ছিল; দেখি খুঁজে ওখানে জুতো পড়ে আছে কি না। এক পাটি জুতো কেউ নেবে না।"

বেশি সময় লাগল না, কিছুক্ষণের মধ্যেই কোচ অ্যাটেন্ডান্ট ভাই দুটি ভিন্ন চেহারার চটি হাতে ফেরত এলেন, একটি কমদামি কালো রঙের অন্যাটি বাদামি রঙের অভিজাত উডল্যান্ডস্। আমার রাত জাগা সার্থক - তবেই না অঙ্কটা মিলে গেল। অ্যাটেন্ডান্ট ভায়েরা বখশিস পেল। এক জুতা যুগলের তো মিলন হলো, অন্যটা সঙ্গী খুঁজে পেলেও প্রভুহীন হয়েই অনাদৃত রয়ে গেল।

পুরী স্টেশনে নামলাম। বেশ ভিড় লোকারণ্যে হারিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। শুভ্রা বলল,"বেশি লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি হেঁটো না; আমি পিছিয়ে যাবো। জুতা যতই দামি হোক একটা জুতার কোন দাম নাই।"

পারানির কড়ি

"স্যার, একটা পরিবারকে কিছুতেই রাজি করানো যাচ্ছে না।" সুদীপ ফোনে বলল।

- কেন ? অসুবিধা কি বলছে ?

বাচ্চাদুটোর মা ভয় পাচ্ছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে চিকিৎসার কাজ চলছিল। সেখানকার কর্মীরা চোখের সমস্যা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করল একটা বাড়িতে দুই বোন চোখে কম দেখে। দৃষ্টিহীনতার কারণ বাচ্চা বয়সের ছানি। কোন কোন শিশু বংশগত এই রোগে ভোগে; এটা খুব বিরল ব্যাধি নয়। যমজ বোন জয়া-বিজয়ার চোখেও এমনই ঘটনা ঘটেছে। ছানির একমাত্র চিকিৎসা যে অপরেশন সেটা ওদের মা কল্যাণী জানে, কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে।

অরূপ বলল, "স্যার, চলুন না একদিন ওদের বাড়ি গিয়ে যদি মা কে বোঝানো যায় তবে হয়ত রাজি হয়ে যাবে।"

- সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে, ফোনে কথা বলে এসব সমস্যার সমাধান হবার নয়। খুব দূর কি? দূর হলেই বা, কোথায় যেতে হবে?

-পাথরপ্রতিমা ব্লকে, একটা পুরো দিন দিতে হবে। কাকদ্বীপ হয়ে পাথর বাজার পর্যন্ত আমাদের গাড়ী চলে যাবে। তারপর নৌকা। রামগঙ্গা দিয়েও বিকল্প রাস্তা আছে - আর একবার নদী পার হতে হবে তাহলে।

-ঠিক আছে, তবে এসপ্তাহেই দিন ঠিক করা যাক।

সকাল সকাল বেরিয়ে কাকদ্বীপের রাস্তা ধরেই চললাম। গঙ্গাধরপুরের পুল পেরিয়ে দুর্বাচটির রাস্তা ডাইনে রেখে আড্ডিবাজার ছাড়িয়ে পাথরপ্রতিমার গঞ্জে পৌঁছালাম। এর পরের রাস্তাটা সরু, তাই গাড়ি বাজারেই রইল। আর একটা নদীর ঘাটে যাবার জন্য হাঁটতে লাগলাম। এগিয়ে অটো ধরতে হবে।

- আচ্ছা অরূপ, এখানে বেশ কটা সোনার দোকান দেখলাম। এখানে এত গয়না পরে কে?

- স্যার, গরিব মানুষেরও মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে ন্যূনতম গয়না গড়াতে হয়। অটো চেপে বেশ খানিকটা দূরে খেয়াঘাট পৌঁছাতে হল। ছোট নৌকা, তাতে জনা বিশেক যাত্রী, তিন চারটে সাইকেল, মুরগির ঝাঁকা। অন্য পাড়ের দিকে - যাত্রা শুরু হল। আমাদের গন্তব্য রাক্ষসখালি দ্বীপটা একটু দক্ষিণ পূর্বে, নৌকা কোনাকুনি যাবে। রোদটা চড়া ছিল না তাই জল ভ্রমন ভালই লাগছিল। একটা বাচ্চা চোখে মজাদার রঙিন চশমা পরে কমলা রঙের বরফ চুষছিল - ওকে দেখতে দেখতেই সময় কেটে গেল।

মাঝি ঘুরে ঘুরে সবার কাছে ভাড়া আদায় করে নিল। নৌকা ঘাটে লাগাতেই ঝপাৎ করে কাছি ফেলার আওয়াজ পেলাম, এসে গেছি তাহলে। অন্যদের পিছু পিছু সাবধানে নৌকো থেকে নেমে কটা সিঁড়ি ভেঙে ডাঙ্গায় উঠলাম।

"চন্ডীদাস মণ্ডলের বাড়ি কোথায়?" চায়ের দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর এল,"একটু দূর আছে, হেঁটেও যেতে পারেন, ভ্যানও আছে। বামদিকের রাস্তা ধরে সামনে গিয়ে মন্দির পড়বে, সেখান থেকে সোজা ডাইনে যাবেন।" অরূপ আর আমি হাঁটতে শুরু করলাম। সূর্যমুখীর ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলতে বেশ ভালই লাগছিল। আধঘন্টা হাঁটার পর চন্ডীবাবুর বাড়ি পৌছে গেলাম। উনি অন্য কয়েকজনের সাথে তখন উঠোনে ধান ঝাড়ছিলেন। আমরা যে যাব তা আগে থেকেই বলা ছিল - তাই ভদ্রলোক সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। "বউমা, ওনাদের দাওয়ায় বসতে দাও, আমি পুকুর থেকে হাত পা ধুয়ে আসছি।" বসতে না বসতেই চন্ডীবাবু ডাব কেটে নিয়ে হাজির। কথা শুরু হল। -"কল্যাণী, এদিকে এস। এই আমার বউমা। ছেলে গুজরাতে কাজ করে দুর্গাপূজার সময় বাড়ি আসবে। সুন্দরবনে তো দেখলেন অবস্থা – কাজের সুযোগ সেরকম তো আর নেই। এরকম অনেক যুবক বাইরে চলে গেছে। দুই মেয়ের বাবা তো - কিছুটা বাড়তি উপায় করতেই হবে মেয়েদের বিয়ে-শাদি দিতে। আমার নাতনি দুটো খুব কষ্ট করে লেখ পড়া করে। আজ ইস্কুল নেই, মাস্টারের কাছে পড়তে গেছে চলে আসবে একটু বাদে।"

বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে চন্ডীদাস কথা বলতে থাকে ।

- ওদের চোখ দেখান নি কোথাও?

- হ্যাঁ, দেখিয়েছি। ডাক্তার বলেছে চোখে ছানি আছে - অপরেশন করাতে হবে, কিন্তু বউমা মোটেই সাহস পাচ্ছে না।

শ্বশুরের সামনে মাথায় কাপড় টেনে কল্যাণী এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিল। এবারে বলেই ফেলল,"ডাক্তারবাবু, ছানি যে অপরেশন করাতে হয় তা আমি জানি। কিন্তু মনে বড় ভয় হয়। আপনাদের হাসপাতালের লোক ডেকে গিয়েছিল, তবুও আমি মেয়েদের নিয়ে যাই নি।"

- কেন কিসের ভয়?

- গরিব মানুষ তো, তাই ভয় হয়।

- আরে! অপরেশন তো সবারই সমান, চোখ তো চোখই। এতে গরিব বা বড়লোকের কি আছে?

- যার টাকা পয়সা আছে সে ভাল জায়গায় যেতে পারে, ডাক্তারবাবু। আমাদের কি আর সেই উপায় আছে? এতক্ষণ কল্যাণী বেশ স্বচ্ছন্দ ছিল। একজন গাঁয়ের বধূ কেমন স্পষ্টভাবে কথা বলে যাচ্ছিল। এতটা সপ্রতিভ সবাই হয় না। হঠাৎ ও কেমন চুপ হয়ে

গেল। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছছে।

আমারও বাচ্চাবেলায় চোখে ছানি পড়েছিল, ডাক্তারবাবু। গরিব বলে বাবা বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে নি। ক্ষেত্রমোহনপুরে একটা কেলাবে (ক্লাব) নাকি বিহার থেকে কোন ডাক্তার এসেছিল। লোকে বলল ভাল, তাই আমার কাকা নিয়ে গিয়েছিল অপরেশন করাতে। চোখে কি একটা ইঞ্জেকশন দিলো অবশ করার জন্য - কিছুই কাজ হলো না। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে অপরেশন শুরু হতেই কি যন্ত্রনা বলতে পারব না। আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম সহ্য করতে পারছি না, সহ্য করতে পারছি না - আমাকে ছেড়ে দিন। আর কথা বলতে পারে না কল্যাণী - দুচোখে জলের ধারা। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে,"চিৎকার করছি দেখে ওরা আমার হাত আর পা দুটো টেবিলের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। আর আমার শক্তি রইল না। মনে হচ্ছিল আর বাঁচব না; ভগবান রক্ষা করেছে।" অপরেশনের পর দেখতে পেলে ?

-না ডাক্তারবাবু, বাম চোখটা অন্ধ হয়ে গেল। এর পর বাবা আমাকে ধার দেনা করে কলকাতায় মেডিকেল কলেজে অপরেশন করালো। ঐ একটা চোখ নিয়েই বেঁচে আছি।

ভাবাই যায় না। এরা ভুয়ো ডাক্তার সেজে কি রকম অন্যায় করে বেড়ায়!

আমি চাই না আমার মেয়ে দুটোর কোন কষ্ট হোক।

ডাক্তার হিসাবে সে ভরসা আমি দিতে পারি, মা। তোমার মেয়েদের অপরেশনে কোন ত্রুটি হবে না।

- মনে হয় কল্যাণীর মনে সাহস যোগাতে পারলাম। বলে এলাম নৌকা পার হয়ে পাথর প্রতিমায় এলে আমরা হাসপাতালে গাড়ি করে নিয়ে যাব। চিকিৎসার খরচ নিয়ে ভাবতে হবে না। এবারে ফিরতে হয়, তাই অনুমতি চাইলাম।

- দুপুরে গরীবের ঘরে দুটো ভাত খেয়ে যান আপনারা, বারোটা তো বাজতে যায়।

- আজ থাক চন্ডীবাবু। বাচ্চারা সুস্থ হোক - নিশ্চয় একদিন আবার আসব।

অরূপ আর আমি খানিকটা হাঁটার পর পিছন থেকে একটা ভ্যান রিক্সা এসে দাঁড়াল, "যাবেন নাকি খেয়া ঘাটে?" উঠে বসলাম দুজনে। ঘাটে এসে দেখি নৌকা বাঁধা আছে কিন্তু কোন লোক নেই তাতে। অগত্যা চায়ের দোকানেই বসতে হল নৌকা ছাড়ার অপেক্ষায়। ঠেকটা যখন চায়ের তখন তাতে চুমুক দেব না তা কি হয়? চায়ের সাথে বিস্কুট থাকতে পারে নাও পারে কিন্তু আড্ডা তো থাকবেই। দোকানদার বলল, "দুপুর বেলা তো,তাই যাত্রী কম একটু লোক জুটুক নৌকা ছাড়বে। বসুন খানিক সময়।" সত্যিই তো সবাইকে খাটনি পোষাতে হবে। গ্রামে আগন্তুক দেখলে কৌতুহল বশত চারিদিকে লোক জুটে যায়। ছ-সাতজন বিভিন্ন বয়সের পুরুষ আমাদের সাথে গল্প করতে লাগলেন। প্রত্যাশিত প্রশ্নাবলী, "কোথা থেকে আসছেন? কি করেন? কার

বাড়ি গেছিলেন?" ইত্যাদি।

-"এই মানিক, তোর ভাইটাকে ডাক তো। ওর চোখটা ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে দে।" চা দোকানি হেঁকে বলে। মানিকও তার ভাইকে ডাকতে ছুটলো। দেখলাম চন্ডীদাসের নাতনিদের চোখের অসুবিধার কথা গ্রামের লোকেরা জানে। "ওরা ভাল লোক, ওদের যদি একটু সাহায্য হয় ওরা বেঁচে যাবে।" সবাই এক বাক্যে বলল।

আস্তে আস্তে ওপারে যাবার লোক জুটে গেল। চা দোকানি বলল, "যান এবারে আপনারা, নৌকা ছাড়বে।" চায়ের আড্ডার লোকজনের মধ্য থেকেই এক সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক নেমে এসে আমাকে হাত ধরে নৌকায় উঠতে সাহায্য করলো। বেশ দেখতে ছেলেটা - ছিপছিপে গড়ন, কিন্তু বলিষ্ঠ চেহারা। শ্যাম বর্ণে যেন শ্যামসুন্দর কেষ্ট ঠাকুর। - কি নাম তোমার ভাই?

আজ্ঞে, নাড়ুগোপাল। -

- তা চেহারাটা তোমার নামের সাথে মিলে গেছে।

সরল হাসিতে সম্মতি জানালো ছেলেটা। ও - ই তো নৌকার মাঝি।

স্রোতটা এখন উল্টো দিকে, তাই যেতে একটু সময় লাগবে। চলুক যত সময় লাগে - আমাদের বিশেষ তাড়া তো নেই। কখনো কখনো সময়ের হাতে নিজেদের সঁপে দিতেও আরাম লাগে। খানিক চলার পর সহকারীর হাতে হাল ধরিয়ে দিয়ে নাড়ু ভাড়া আদায় করতে লাগল। সবার কাছে হাত পাতে, কিন্তু কই আমাদের দিকে তো আসে না। অগত্যা নামার সময় অরূপ টাকাটা নাড়ুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "কি গো? আমাদের ভাড়াটা নেবে না?" ও মা! করে কি? নাড়ু গোপাল হাসি মুখে হাত জোড় করে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে,"ওটা থাক। আপনারা কত বড় কাজ করতে এসেছেন। আপনাদের মতন মানুষের উপকার তো আমি করতে পারব না। অন্ততঃ এটুকু আমাকে করতে দিন।" আমরা বলি,"এরকম করো না, তোমার খাটুনির মূল্য নেই?" আবার হাত জোড় করে। এরপর আর জোরাজুরি চলে না। ওঁর ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো ছাড়া বিকল্প কিছু করার রইল না।

- ভাল থেকো ভাই। আবার দেখা হবে।

- সাবধানে যাবেন।

আমরা বিদায় নিলাম।

এর পরের ঘটনাবলি নির্ধারিত পথে বয়ে চলল। অবশ্যি কল্যাণীর সমস্ত শংসয় আগে দূর করতে হয়েছে। হাসপাতালে ওদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা আমরাই করেছিলাম। অজ্ঞান করার ব্যবস্থা নিজে চোখে দেখে, ডাক্তারের সাথে কথা বলে তবেই জয়া-বিজয়ার মা তার সম্মতি দিলেন। প্রথমে একটা করে চোখের অপরেশন হয়ে গেল।

সেদিন বিকেলে ওয়ার্ডে গিয়ে দেখি মেয়ে দুটো জোড়া খাটে শুয়ে - এক একটা

করে চোখে পটি বাঁধা। কল্যাণী হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে মেয়েদের পায়ের কাছে বসে। আমাকে দেখে ধীরে মাথাটা তুলল। পুরু চশমার কাঁচের মধ্য দিয়ে উদ্বিগ্ন চোখটা আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। নার্স ব্যান্ডেজ খুলে দিতে যেন ওর উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল, "ভাল আছে তো?"

-"সব ঠিক আছে মা, নিশ্চিন্ত থাকো।"

কল্যাণীর মুখে হাসি ফুটল। এবার আর কোন বাধা রইল না। পরবর্তী দেখাতে আসা, চশমা নেওয়া, আর একটা করে চোখের অপরেশন পরপর সব যথা সময়েই হয়ে গেল। এখন মাঝে মধ্যে ফোনে কথাবার্তা হয়। অতদূরের দ্বীপ থেকে যাতায়াত তো সহজ কথা নয়।

তিন - চার বছর পার হয়ে গেছে। এখন যোগাযোগ প্রায় বন্ধ; করোনার অতিমারি পৃথিবীটাকে বদলে দিয়েছে। কদিন আগে একটা ফোন পেলাম চন্ডীদাসের কাছ থেকে, "ডাক্তারবাবু একটা বিশেষ অনুরোধ আছে, একটু সাহায্য করতে হবে, একবার আসতে পারবেন আমাদের বাড়িতে?" আমি চিন্তিত হয়ে ভাবলাম বোধ হয় চোখের কোন সমস্যা হয়েছে। - ওদের দৃষ্টি ঠিক আছে তো?

না সেসব অসুবিধা নেই, ব্যাপারটা অন্য ।

- কি সাহায্য করতে পারি বলুন ?

- লকডাউনে ছেলে বাড়ি এসেছিল। বউমার সাথে পরামর্শ করেছিল মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে। নাতনি দুটো তো ভালই পড়াশুনা করছে। আরও পড়ুক না। মেয়েরাও তো এখন কত এগিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটাকে তো বেশি পড়াতে পারিনি অভাবের জন্য। নাতনিরা কলেজে যাক, ওরা পারবে।

- সে তো আপনি ঠিকই বলেছেন। এরকম চিন্তা তো সব অভিভাবক করে না।

ডাক্তারবাবু, আগেরবার তো আপনি চোখ অপরেশনের ব্যাপারে বুঝিয়েছিলেন। আশা করি বউমা আবার আপনার কথা শুনবে।

- নিশ্চয় যাব, একটু লকডাউনের কড়াকড়ি উঠুক। আমার মতন করে চেষ্টা করব যতটা পারি।

কত ভরসা করে চন্ডীদাস তাঁর অন্তরের কথা বললেন, যেতে তো হবেই। মন চলে যায় সেই নদী নালার দেশে। আবার সেই তো নাড়ুগোপালের খেয়ায় নদী পার হতে হবে। পারানি তো তুমি নেবে না রসিক নেয়ে। দিতে গেলেই মুচকি হেসে হাত দুটো জোড় করবে। পারানি তো দিতেই হবে হে। আমার তো গান নেই যে তোমায় গান দিয়ে ভোলাব। তবে কি জীবনে জীবন দিয়ে পারানির কড়ি শুধতে হবে?

প্রাণের মানুষ

অনেকদিন আগের কথা। তখন আমি দক্ষিণ ভারতে পড়াশুনা করি মাদুরাই শহরে। কাজের চাপে এত দ্রুত দিনগুলো কেটে যায় যে বাইরের জগৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় থাকে না। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে চিকিৎসা শিবির উপলক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রাম-শহর দেখার সুযোগ আসে - এটাই বড় পাওনা। বাইরে যাওয়া মানেই একটু ভিন্নতর প্রকৃতি, একটু অন্য স্বাদের খাওয়া, সে ইডলি-সাম্বর বা রসমই হোক, আর বিচিত্র মানুষের পরিচয় পাওয়া। এরই মধ্যে একটি ভ্রমনের স্মৃতি অন্তরের গভীরে গেঁথে আছে। সঞ্চিত ধনের মত যতবার তাকে ছুঁতে যাই ততবারই নূতন করে সঞ্জীবিত হই। এমন চিরস্থায়ী আনন্দ খুব একটা জোটেনা জীবনে।

আমাদের গন্তব্য ছিল মালাভানথাঙ্গাল নামের একটি গ্রাম। যারা তামিল ভাষা শুনতে অভ্যস্ত নন তাদের পক্ষে এই রকম স্থান-নাম উচ্চারণ বিশেষ সহজ নয়। একটু বর্ননা দিই যাত্রাপথের, নাহলে ঐ প্রত্যন্ত জনবিরল গ্রামে পৌঁছানো যাবে না। কন্যাকুমারী থেকে মাদুরাই - তিরুচিরাপল্লী হয়ে যে রাস্তাটা মাদ্রাজ গিয়েছে সেই পথেই পড়ে ভিল্লুপুরম্। সেখান থেকে পূর্বমুখী রাস্তাটা যায় পন্ডিচেরী আর পশ্চিম মুখে তিরুআন্নামালাই । পশ্চিমের পথে বেশ খানিকটা গেলে ভেট্টাভালমের কিছুটা পূর্বে আসে কান্ডাচিপুরম্ -এখানেই বাজারহাট শেষ। এখান থেকে সরু রাস্তা উত্তরে ধরলে পৌঁছে যাওয়া যায় মালাভানথাঙ্গল।

পৌঁছাতে বিকেল হয়ে গেল। জায়গাটা বেশ পাথুরে। উঁচু-নীচু টিলায় ভরা। গাছ বলতে নানান জাতের ক্যাকটাস, নিম আর তেঁতুল-ই মূলতঃ। পেরুমল আমাদের কস্তুরবা কুষ্ঠ নিবারন নিলয়মে পৌঁছে দিয়ে হাঁফ ছাড়ল, প্রায় দশ ঘন্টা গাড়ি চালিয়েছে সে। মাঝখানে শুধু তিরুচিরাপল্লীতে কাবেরী নদীর ধারে তট্টাচারিয়ার আমবাগানে মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি ছিল। কুড়ি- বাইশজনের মতন দলে আমরা। আশ্রমে পৌঁছানো মাত্র অভ্যর্থনা করে আমাদের গাছের ছায়ায় খাটিয়ায় বসানো হল। কর্মীরা সবাইকে এক কাপ করে কফি পরিবেশন করে থাকার নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিলেন।

মহাত্মা-পত্নী কস্তুরবা গান্ধীর স্মৃতিতে তৈরী এই কুষ্ঠ নিবারণ কেন্দ্র। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়ানো নানান মাপের বাড়ি - সবই একতলা। দুই একটি বেশ পুরনো এবং গঠনশৈলী দেখলে মনে হয় ইংরেজদের হাতের ছোঁয়া আছে। এক কালে এটি একটি ফরেস্ট বাংলো ছিল, তাই এখনও স্থানীয় লোকেদের ভাষায় এর নাম 'বাংলো অস্পতিরি (হাসপাতাল)'। এখন দেখলে বনের চিহ্ন মেলে না। অধ্যাপক টি. এন.জগদীশনের উদ্যোগে এখানে কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল। একটা

সময় ছিল যখন কুষ্ঠ আক্রান্তদের এই রকম রোগ নিবারণ কেন্দ্রে রেখে ওষুধ দিতে হত। পরিবার ছেড়ে এই রকম আশ্রয়ে থাকাটা প্রায় সামাজিক নির্বাসনের নামান্তর বললে অত্যুক্তি হবে না। দিন বদলেছে, এখন বাড়ীতে রেখেই কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা চলে। তাই এই আশ্রম এখন একটা পুনর্বাসন কেন্দ্র। যাদের ব্যাধির কারণে শারীরিক অক্ষমতা এসেছে তাদের নিয়েই নানান কর্মকান্ড চলে এখানে। অধ্যাপক জগদীশন এই নিলয়ম উদ্বোধনের জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। রাজি হননি তিনি, এবিষয়ে মহাত্মার উত্তরটাও বেশ মনে রাখার মত।

-"অন্য কাউকে ডেকে নাও। হাসপাতাল উদ্বোধন কোন বড় কথা নয় বরং আমি ওটাকে বন্ধ করতে আসব।" অর্থাৎ বাপু চেয়েছিলেন যথার্থই যেন কুষ্ঠরোগের নিবারণ হয় এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এই শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা যার হাতে তাঁর পরিচয় কিছুটা না দিলে এই আশ্রমের পরিচয়টা শুধু কিছু বাড়ি-ঘরের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। যদিও অধ্যাপককে অল্প কথায় পরিচয় করিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং ওনার কথাতেই ওনার একটা চিত্র নির্মান করা যাক। আত্মজীবনীর মুখবন্ধে উনি লিখছেন, -

"যখন আমার চলচ্ছক্তিহীণা কন্যা শয্যাশায়ী হয়ে বেডসোরে কষ্ট পাচ্ছে তখন আমার পক্ষে আত্মজীবনী রচনা সহজ ছিল না। কিন্তু ওর কষ্ট সহ্য করার ধৈর্য্য এবং সরল হাসি আমার জন্য এক অসাধারণ অনুপ্রেরণা বয়ে আনল। সময়ের সাথে সাথে আমিও অনুভব করলাম দুঃখের গভীর অর্থ, তার মূল্য এবং মানুষের আত্মশক্তিকে এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার ক্ষমতাকে। এই উপলব্ধিই আমাকে আনন্দের সাথে যুদ্ধ করতে শেখালো এবং কুষ্ঠরোগের মধ্য দিয়ে আমাকে জীবনের পূর্ণতায় পৌঁছে দিল।"

ওনার কাকার সূত্র ধরে বাড়িতে কুষ্ঠ সংক্রমণ হয়েছিল। নিজে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, একই রোগের কারণে মা কেও দীর্ঘদিন মাদ্রাজের চেঙ্গালপাট্টু কুষ্ঠ নিবারণ কেন্দ্রে ভর্তি করতে হয়েছিল। অধ্যাপক শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর একনিষ্ঠ অনুগামী জগদীশন নিজেও ছিলেন ইংরাজি সাহিত্যের সফল অধ্যাপক এবং লেখক। সেই সূত্রেই কাজ করেছেন সুদূর করাচিতে এক প্রকাশকের কাছে। কিন্তু অকল্পনীয় রোগ যন্ত্রণা নিয়ে তাকে মাদ্রাজ ফিরে আসতে হয়েছে। সেই সুদীর্ঘ ট্রেন যাত্রার বিবরণ যে কোন পাঠকের মনকে ভারাক্রান্ত করে দেবে। নিজের তিন সন্তানের মধ্যে হারিয়েছেন শিশুপুত্রকে, বড় মেয়ে পাঁচ বছর বয়সে মস্তিকের অসুখে আক্রান্ত হবার পর সারাজীবন হুইল চেয়ারেই জীবন কাটিয়েছে। পিতা হিসাবে আমৃত্যু তিনি কণ্যার সেবা করেছেন। তার পরেও তিনি মনে করেন জীবনে যা কিছু পূণর্তা তিনি লাভ করেছেন তা তাঁর কুষ্ঠরোগের জন্য। অসামান্য প্রত্যয়ে ভরা আত্মজীবনীর নাম তাই "Fulfilment through Leprosy". আশ্রমের যে বাড়িটা বর্তমানে অতিথিগৃহ সেটি আসলে অধ্যাপকের

নিজের ঘর ছিল। প্রতিটি দরজায় হুইল চেয়ার চলার জন্য ঢালু রাস্তা করা আছে। এই র‍্যাম্পগুলি মীনা (মীনাক্ষী)র স্মৃতি বহন করছে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতির কারণে সাধারণ মানুষ কুষ্ঠরোগীদের ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। হতভাগ্য মানুষগুলোও তাই লোক চক্ষুর আড়ালে নিজেদের সরিয়ে রাখে। খুব প্রয়োজন না হলে এরা সাধারণ চিকিৎসা কেন্দ্রে আসতে চায় না। কস্তুরবা কুষ্ঠ নিবারণ নিলায়মে একটা অপারেশন থিয়েটার আছে যেখানে মাঝে মাঝে এই সব রোগীদের চোখের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এটাই এখানে আসার উদ্দেশ্য।

প্রথম সন্ধ্যায় একটু বিশ্রাম মিললেও পরদিন ভোর থেকে জোর কদমে কাজ শুরু হল। প্রচুর মানুষের ভীড়। তাতে একদা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষও আছেন। এদের বিভিন্ন ডাক্তারি পরীক্ষা করে অপারেশনের জন্য নির্বাচন করার কাজ চলল দুপুর পর্যন্ত। তারপর যারা নির্বাচিত তাদের অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি। তৃতীয় দিনে অপারেশন চলল ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত। বড় দলটা ভাত খেয়ে মাদুরাই ফেরৎ চলে গেল আর শ-তিনেক রোগীর দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে দুই ডাক্তার ও তিনজন নার্স থেকে গেলাম আরও চার দিনের জন্য।

এই চারদিন সকাল বিকেল ভর্তি থাকা রোগীদের দেখাশুনা আর অল্প কিছু নূতন রোগী দেখা ছাড়া বিশেষ কিছু কাজ ছিল না। কাজের ফাঁকে কিছু পাঠ্য বই, গল্পের বই পড়া আর ওয়াকম্যানে ক্যাসেট লাগিয়ে গান শোনা এই ভাবেই সময় কাটত। কাজ কম থাকলে বোধহয় চা-কফি খাবার ইচ্ছাটা একটু বেশি-ই হয়। এখানে অনুরোধ করলে সানন্দে এরা তা বানিয়ে দেন কিন্তু বলতে দ্বিধা হয়। একাই একদিন চা পানের জন্য দোকান খুঁজতে বেরোলাম। আমার সঙ্গী অন্য ডাক্তার একজন মহিলা, তাই তাকে নিয়ে রৌদ্রে টোটো করা সাজে না। মিনিট পনের উঁচু নীচু রাস্তায় হেঁটে পিচ রাস্তায় পৌঁছতে তবে একটা ছোট চায়ের দোকান চোখে পড়ল। এখানেও খদ্দের খুবই কম তাই অনবরত উনুন জ্বলার প্রশ্ন নেই। দোকানদার স্টোভ জ্বালিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়ালেন। এতেই মালুম হল আশ্রমের অবস্থান কতটা প্রত্যন্ত।

ধীরে ধীরে নিলয়মের কর্মীদের সাথে আলাপ পরিচয় ঘটে। সকাল বিকাল এক বৃদ্ধ খোঁজ নিয়ে যান পাণীয় জলের পাত্র খালি কি না বা অন্য কিছু প্রয়োজন আছে কি না। সযত্নে স্মিত হেসে পাত্রটা ভরে দেন। ফোকলা দাঁতটা বেরিয়ে পড়ে। এনার নাম মুরুগেশন, রোগী হয়ে একদা এসেছিলেন, এখন এখানকার সর্বক্ষণের কর্মী। বিকেল বেলা এর একটা বিশেষ কাজ লক্ষ্য করতাম - একটা মালবাহী রিক্সায় বড় জলের ড্রাম বসিয়ে রাস্তায় জল ছেটানো; যাতে হাসপাতালে ধুলো নিবারণ হয়। দেখা হলেই হাসি মুখে ডান হাতটা বুকের কাছে তুলে 'ভনক্কম্' (নমস্কার) আর 'রম্ভ সন্তোষম্' (খুব খুশি হলাম) বলতেন। সাদা জামা, ভাঁজ করা ধুতি আর ঘাড়ে সাদা গামছা ফেলা মানুষটা

গাড়িতে দাঁড়িয়ে জল ছড়াতে ছড়াতে দূরে মিলিয়ে যেত।

বিকেলের প্রখর রোদটা সরে গেলে বৈষ্ণবীকে দেখতাম তার দলবল নিয়ে লেদার ওয়ার্কশপের দিকে যেতে। সে এখানকার কারিগরী শিক্ষিকা - খুবই উৎসাহী মাহিলা। নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে একদল প্রান্তিক মানুষকে নিয়ে কাজ করে চলেছেন। এরা সবাই মিলে একটা বড় জুতোর কোম্পানীর জন্য চামড়ার সুখতলা তৈরি করেন।

আশ্রমের কর্মীদের মধ্যে যার সঙ্গে আমাদের বেশি আলাপ চলত তিনি গায়ত্রী, নিলয়মের অফিসের দায়িত্বে। হঠাৎ আমার সহকর্মী সোনিয়া বলল, "গায়ত্রীর মা বাংলা বলতে পারেন। জান?"

"তাই নাকি? উনি কি বাঙালি?"

"না, উনি তামিল।"

গায়ত্রীকে ধরলাম ওর মার সাথে আলাপ করব বলে। বাংলার বাইরে থাকলে একটু বাংলা শব্দ কানে এলেই মনটা আনন্দে সাড়া দেয় তাও আবার এই প্রত্যন্ত তামিল গ্রামে। এখানে বাংলা কথা বলতে পারব - এর আকর্ষণই আলাদা। গায়ত্রী সানন্দে বিকেল বেলা চায়ের আমন্ত্রণ জানালেন। এক অনন্য উৎসাহে আশ্রমের মধ্যেই ওঁদের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। একটা ছোট অতিসাধারণ আবাস - এখানেই মা, বাবা আর দিদিমাকে সাথে নিয়ে গায়ত্রীর বাস।

আমরা যাব সেটা জানাই ছিল। তাই গায়ত্রীর মা জানকী আম্মা তৈরিই ছিলেন সাদর অভ্যর্থনার জন্য। ষাটোর্দ্ধা ভদ্র মহিলার দুই হাতে কুষ্ঠ রোগের ফেলে যাওয়া চিহ্ন। দু-চোখে পুরু চশমায় চোখ দুটো বেশ বড়ো দেখায়। সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা যায় মুখের অমলিন হাসি যা অন্তরের পরিচয় বলে দেয়। ওনার স্বামী শ্রী ভেঙ্কটরমন বাড়ীতেই ছিলেন নমস্কার বিনিময় হল । দিদিমা শয্যাশায়ী, বিশেষ কথা বলতে পারেন না।

বাইরের উঠোনে রাখা একটা খাটিয়াতে বসতে খুব লোভ হচ্ছিল, তাই ওখানেই বসা হল। পাশে এক চালা একটা গোয়াল ঘর, সেখানে একটা ছোট্ট বাছুর তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছে। আড্ডার যথার্থ পরিবেশ। দেরি না করে আমি সরাসরি প্রশ্ন করে ফেললাম, "আপনি নাকি বাংলা বলতে পারেন?"

"পারি তো।" অকপট উত্তর আমার।

"কতদিন আগে শিখেছেন?"

"তা পঞ্চাশ বছর তো হবেই।" "এখনো বলেন কি করে?"

"ভুলতে পারি না তাই।" কি সহজ অথচ প্রত্যয়ী উত্তর। বাংলা শেখার উৎসটা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে রইলাম। জানকী দেবীর বাবা পূর্ব রেলের কর্মচারি ছিলেন তাই

ওনার ছোট বেলা কেটেছে ধানবাদের রেল কলোনিতে। সেখানে অনেক বাঙালি প্রতিবেশী থাকত। যে সব পরিবারের সঙ্গে ওদের বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল তারা সবাই প্রায় বাংলাভাষী। অসাধারণ স্মরণ শক্তি বলতে হবে। অর্ধশতকের ব্যবধানেও বাংলা কথা কত সাবলীল - তামিল টান অবশ্যই আছে। না থাকলে সেটা অস্বাভাবিক হত। এর পরের যে প্রশ্নটা আমার মধ্যে বারবার আসছিল তাহল ধানবাদ থেকে দক্ষিণ আর্কট জেলার অখ্যাত গ্রাম মালাভানথাঙ্গাল - এই যোগ সুত্রটা কোথায়? এটা জানতে গেলে হয়ত কিছু ব্যাক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়তে পারে তাই প্রথম দিনের আলাপে আর জিজ্ঞাসা করমাল না। বেশ গল্পগুজব হল বাংলা-তামিল-ইংরাজি মিশিয়ে। কথার পিঠে কথায় কথায় সন্ধে হয়ে গেল। আমরা অতিথি ভবনে ফেরৎ এলাম। ফেরার পথে সোনিয়া বলল, "তুমি ওনার কাছে গান শুনতে চাইলে না?" "তাই? গান জানেন? কাল হবে তাহলে।"

পরদিন বিনা আমন্ত্রণেই গান শোনার আব্দার নিয়ে গেলাম। এদিন একটু সন্ধ্যার দিকে। খাটিয়াতেই বসা হল। পিছনে সেই গোয়াল ঘর। তার পিছনে ছোট্ট একটি টিলা, যার উপরে পশ্চিমের পড়ন্ত রোদের আলো।

"একটা বাংলা গান শোনাবেন?"

"কি শুনবে বল?" তার মানে অনেক গান জানা আছে।

"যেটা পছন্দ।" আমি বললাম।

একটু গুনগুন করে নিয়ে ধরলেন, "ওরে নূতন যুগের ভোরে, দিসনে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে।" আস্তে আস্তে স্বর উচ্চগ্রামে উঠল। - অপ্রত্যাশিত স্থানে, অপ্রত্যাশিত কণ্ঠে আমার মাতৃভাষা আমার কানে আসছে। তা আবার যার বাণী ভর করে তিনি রবীন্দ্রনাথ। হৃদয় তোলপাড় করা অনুভূতি। "চলায় চলায় বাজবে জয়ের ভেড়ী" কী বলিষ্ঠ কণ্ঠ!

একটা গান শোনার পর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা - গানের রেশ উপভোগ করার জন্য। গায়ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম উনি কি এই রকম উঁচু স্কেলে গাইতে অভ্যস্ত? উত্তরটা আম্মাই দিলেন এই বলে, -"ভিতর থেকে গান আসলে স্কেল বেঁধে রাখা যায় না।" এবারে জানকী আম্মা আমাকে অনুরোধ করলেন, "আমাকে একটু 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটা ইংরাজি হরফে লিখে দেবে? বাংলা বলতে পারি, পড়তে পারি না।" আমার কাছে ব্যাপারটা সহজ ছিল কারণ শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের একটা ক্যাসেটে ঐ গানটা ছিল। আমি গানটা লিখে ক্যাসেটটাও ওনাকে দিয়ে এলাম। বলা বাহুল্য খুব খুশিই হলেন।

"আপনি কি রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখতেন?" আমার প্রশ্ন। "না না, একদম নয়।" সলজ্জ উত্তর। - "তবে ? এত নির্ভুল সুর কোথা থেকে এল? যে গানটা গাইলেন সেটাও

তো খুব প্রচলিত নয়।"

"আমার পাশের বাড়ির বন্ধু ছিল গীতা - গীতা বোস। ওর গানের মাস্টার মশাই আসত আর আমি শুনতাম গান শেখানো। এতেই যা মনে আছে।" এ তো একবারে একলব্য! মনের গভীর ভালবাসা না থাকলে এমনটা হয় না।

পরদিন নিজেই ডেকে পাঠালেন ওনার বাড়িতে। এক বেলাতেই "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" কয়েকবার শুনেও নিয়েছেন। বললেন, "যেদিন রোগীদের ছুটি হবে সেদিন বিদায় সভায় এই গানটা আমার সাথে গাইবে?"

দ্বিধাহীন সম্মতি দিলাম।

একটা বিরাট প্রশ্ন তো অমীমাংসিত থেকে গেল। ঐ ধানবাদ থেকে মালাভানথাঙ্গাল - যোগসূত্রটা কি ? উত্তরটা অনেক পরে পেলাম অধ্যাপক জগদীশনের আত্মজীবনীতে। এই বইতে যে অধ্যায়ে উনি কুষ্ঠ নিবারণ আন্দোলন সংগঠনের কথা বলছেন সেখানে বর্ণিত আছে একটা ঘটনা। মানুষের মধ্যে চেতনার উন্মেষ ঘটাতে উনি যেখানেই যেতেন সেখানেই মানুষজনকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে কুষ্ঠকে অযথা ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আশি শতাংশ কুষ্ঠই ছোঁয়াচে নয় এবং সব ধরণই চিকিৎসার পর আর সংক্রামক থাকে না। প্রাথমিক অবস্থায় ওষুধ খাওয়ালে কুষ্ঠ সম্পূর্ন নিরাময় যোগ্য।

অখিল ভারত কুষ্ঠ সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল কলকাতায়। এই উপলক্ষে জগদীশন ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ আসানসোল থেকে কলকাতা আসছিলেন। ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় সহযাত্রীদের সাথে সেই সচেতনতা মূলক আলোচনা চলছিল। বক্তব্য রাখার সময় অধ্যাপক লক্ষ্য করলেন একজন তামিল ভদ্রলোক আশাতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে ওনার কথা শুনছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি অধ্যাপকের গা ঘেঁষে বসলেন এবং কুষ্ঠ সংক্রান্ত বহু প্রশ্ন করতে থাকলেন। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থামার পরও ওই ভদ্রলোক অধ্যাপকের সাথে হাঁটতে থাকলেন এবং ব্যক্ত করলেন যে ব্যাক্তিগত তাগিদেই তার এত জিজ্ঞাসা। শ্রী জগদীশন তাকে পরের দিন ডা. চক্রবর্ত্তীর বাড়ি, যেখানে তিনি ছিলেন, দেখা করতে বললেন। যথারীতি দেখা হল এবং তখনই জানা গেল তার উদ্বেগের কারণ। প্রিয়তমা কণ্যার কুষ্ঠ রোগ তাকে বিচলিত করে তুলেছে। মানসিক যন্ত্রণায় রাতের ঘুম চলে গেছে। বিহারের (তখনো ঝাড়খন্ড হয়নি) যে শহরে উনি থাকেন সেখানে চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা নেই। তিনি শুধু কন্যার চিকিৎসা নয়, অন্যান্য সন্তানদের রোগ সংক্রমণের থেকে রক্ষা করার বিষয়েও চিন্তিত। অধ্যাপক এই বিপন্ন পিতাকে সাহায্য করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন। তামিল দেশের মালাভানথাঙ্গালে কস্তুরবা নিলয়মে কন্যার চিকিৎসা এবং ভরণ পোষনের ব্যবস্থা হল। এই কন্যাই আজকের জানকী আম্মা। সফল রোগ মুক্তির পর এই আশ্রমের ল্যাবরেটারীর কর্মী হওয়া, লেপ্রসী ইনসপেক্টর ভেঙ্কটরমনের সাথে

বিবাহ, দুই কন্যাকে বড় করা এবং অবসর জীবন যাপন সবই এই নিলয়মের মাটিতে।

চতুর্থ দিনের সকালে সবার ছুটি হবে তাই ভোর বেলা থেকে কাজের ব্যস্ততা চলল। সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করতে হবে। সভারও আয়োজন হতে থাকল, কিন্তু খবর এল আমন্ত্রিত অতিথিরা মাদ্রাজ থেকে আসতে বেশ দেরি করবেন। আমাদের অনেক পথ যেতে হবে; তাই অপেক্ষা দীর্ঘতর না করে সকলে মাদুরাই এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। একসাথে গান গাওয়ার ইচ্ছাটা অধরাই থেকে গেল। আশ্রমের মানুষগুলো কদিনেই বড় আপন হয়ে গেছিলেন। সবাই গাড়ির কাছে এসে আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় দিলেন। "পৈট ওয়াঙ্গা (এস গিয়ে)"।

গাড়ি এগিয়ে চলে, মনে অন্য রকম একটা আবেশ - দুপাশের দৃশ্য কিছুই চোখে ধরে না। যে মানুষগুলোকে ছেড়ে এলাম তারা সবাই এক একজন অপরাজিত বা অপরাজিতা - ভালবাসার ধন সম্বল করে সকলে জীবন যুদ্ধে উত্তীর্ণ। স্মৃতির সরণি বেয়ে বহুবার মালাভানথাঙ্গালে ফেরত গেছি, মনে করতে ভাল লেগেছে সেই মুখগুলো যাতে শুধুই সারল্যের প্রকাশ। ছোঁয়ার চেষ্টা করেছি অযাচিত ভাবে পাওয়া রবীন্দ্রনাথকে। আর আনন্দময়ী জানকী আম্মা? মনে হয় যেন অচিন্ পথে চলতে চলতে প্রাণভরে পেয়েছিলাম কোন প্রাণের মানুষ যিনি সতত জেগে থাকেন অন্তরের গভীরে ।তাই তো পথ চাওয়াতেই আনন্দ।

সাম্পান

সূর্যাস্তের সময় হয়ে এল। কক্সবাজার শহরের ভিড় এড়িয়ে দিনান্ত উপভোগ করতে আরও দক্ষিণে রেজুখাল পেরিয়ে ঝাউবনে চলে এলাম। বেশ মনোরম পরিবেশ, তখনও দিনের আলো আছে - একের পর এক রঙের বদল হবে এবার; সেই অপেক্ষায় রইলাম। হলুদ, কমলা, লাল আর বেগুনি রং নানান রূপে এবার প্রেমের হোলি খেলবে।

ছেলের দল তখনও বালির উপর ফুটবল খেলছে আর সাগরতীরে বিশ্রাম নিচ্ছে খান দশেক নৌকা।শুনলাম সন্ধ্যা নাগাদ জোয়ার আসবে, তখন এদের এক এক করে ঠেলে জলে নামানো হবে। এই নাও চড়েই জেলেরা যাবে মাছের সন্ধানে।

সফি, এখনকার নৌকাগুলো কেমন অন্যরকম দেখতে, তাই না? বেশ চাঁদের মতন কোনদিন এরকম দেখিনি।

–দাদা, এগুলো এই চট্টগ্রাম অঞ্চলেই বেশি দেখবেন। এদের নাম সাম্পান।

–সাম্পান? বড় রোমান্টিক নাম যে! 'আমি চান্দেরই সাম্পান যুদি পাই' - তাই না?

ঝাউ গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বালুকাবেলা, পাড়ে রাখা সাম্পানের গায়ে বঙ্গোপসাগরের জল ছলাৎ ছলাৎ করে লাগছে, আরও দূরে ঢেউয়ের মাথায় দুই একটা নৌকা মোচার খোলার মতন দোল খাচ্ছে - তাতে মানুষ কতজন আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। দিগন্তে দিনান্তের ক্লান্ত তপন বিশ্রামে যাবার আগে অম্বর আর অর্ণবকে নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এমনই এক পটভূমিতে দেখা পেলাম সাম্পানের। পরিচয়টা এমনভাবে নির্ধারিত ছিল কে জানত?

"আঃ, আঃ, আঃ, আঃ" - বালক কণ্ঠের আওয়াজে ঘুরে তাকালম। দেখি খালি গা, খাটো লুঙ্গি পরা একটা ছোট ছেলে লাঠি দিয়ে লাল কাঁকড়াকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। সফি বলে, 'দেখেন দাদা, এইটা নাকি ওর পোষা কাঁকড়া।বলে নাকি ওর সব কথা শোনে।' কাঁকড়াও পোষ মানে? ভালবাসায় হয়ত বা তাও সম্ভব।

-তর (তোর) নাম কি রে? সফি জিজ্ঞাসা করে।

– জিল্লু।

বাঃ, বেশ ছন্দময় নাম তো। লাফিয়ে লাফিয়ে চলার সাথে নামের মিল আছে। একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে লুঙ্গিটাকে দুই পায়ের ফাঁকে কাছা মেরে তড়াক্ করে পাশে রাখা একটা সাম্পানে উঠল। হালকা শরীরে অবলীলায় নৌকার নাগরা জুতোর মতন বাঁকানো গোলুইতে চড়ে বসল। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম জিল্লুর দুষ্টু হাসি ভরা মুখটা। পড়ন্ত সূর্যের আভায় তা আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। স্থির কি আর থাকে? একটু পরেই একলাফে নামে নৌকার খোলে, তারপর আর এক লাফে সাম্পান থেকে বালিতে।

- এই তোর বয়স কত রে?

–আষ্ট বসর (আট বছর)

–ইস্কুলে যাস?

–মাদ্রাসায় যাই।

ওর আর স্কুল? প্রকৃতির যে পাঠশালাতে বড় হচ্ছে তার থেকে বড় বিদ্যালয় আর কোথায় আছে? আমার হাতে ক্যামেরা ছিল, ক্রমাগত সূর্যাস্ত আর সাম্পানের ছবি তুলছিলাম। দেখলাম একটা মোটা টায়ার লাগানো ঠেলা গাড়ি এল। তাতে একটা সাম্পান জুড়ে দিয়ে মাঝিরা কজন মিলে তাকে জলের দিকে ঠেলতে থাকল। আমার কাছে সব নূতন - যা দেখি তাই ভালো লাগে। জিল্লু আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "আমার ভিডিও কিন্তু উঠাবা না,' বলেই অন্ধকারে এক দৌড়। সফি বলে, 'পালাইল ক্যান?" বাচ্চা পালাবে তা আর নূতন কথা কি ?

''রোহিঙ্গা পোলা হইতে পারে, মনে হয় ওদের পরিবার কোনরকমে ক্যাম্পের বাইরে আইস্যা পড়সে। বাচ্চা তো তাড়াতাড়ি বাংলা শিখ্যা ফ্যালসে।''

সমুদ্রের রং অন্ধকার বাড়ার সাথে সাথে আরও গাঢ় বেগুনিবরণ হয়ে গেল। পুবের আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। দাঁড়িয়ে থাকা সাম্পানগুলোর মধ্যে দিয়ে চাঁদটাকে নানান ভাবে দেখতে লাগলাম, সেই চান্দেরই সাম্পান। ক্যামেরার ফ্রেমে সাম্পানের দুই প্রান্ত দুপাশে রেখে চাঁদটাকে মাঝখানে বসাতেই মনে হলো যেন দুই বাহু দিয়ে সাম্পান পূর্ণিমার পূর্ণেন্দুকে প্রেমের আলিঙ্গন করছে।

তিনদিন লেখাপড়ার কাজে কক্সবাজারে সময় কেটে গেল। চতুর্থ দিনের গন্তব্য উখিয়ার রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির। সেখানেও কিছু চিকিৎসার কাজ। বেশ সকাল সকাল আমরা চারজনের একটা দল হোটেল থেকে রওনা দিলাম। কক্সবাজারে এখন অসংখ্য বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অবস্থান। সবাই কোন না কোন ভাবে শরণার্থী সেবার কাজ করছে। সকলেরই প্রায় অবস্থান এই সৈকত শহরে। প্রতিদিন সকালে স্বেচ্ছাসেবীদের গাড়ির কনভয় যায় আর বেলা দুটো বাজলেই সমানভাবে ফেরত আসে। গাড়ির ভীড়ে যাতে না পড়ি তাই আগেভাগে বেরনো।

বেশ খানিকটা সমুদ্রের ধারে ধারে এগোন গেল। রেজুখাল পেরলাম, আগের দিন ঘুরে যাওয়া ঝাউবনটা এলো, এখনো গুটি কতক সাম্পান পাড়ে রাখা আছে। দিনের বেলা রোদ ঝলমল সমুদ্রের অন্য এক রূপ। এবার গাড়ি বামদিকে বাঁক নিল। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গার মতন এই জায়গাটা সমতল নয়, ছোট ছোট পাহাড় চোখে পড়ে - সবই গাছে গাছে ঢাকা ঘন সবুজ। দূরে উঁচু পাহাড় দেখিয়ে মইদুল বলে, 'দাদা, এটা হল বর্মা সীমান্ত। রোহিঙ্গারা পাহড়ের ওপার থেকে এসেছে। ঘন্টা দুই যাবার পর উখিয়া পৌঁছে গেলাম। এতক্ষণ রাস্তার ধারে ছিল পাহাড়, শান্ত সবুজ মাঠ আর মাঝে

মধ্যে দুই একটা ছোট বড় বাজার। এবার চোখের সামনে কাঁটাতারের দীর্ঘ বেড়া; দেখলেই যেন চোখে কাঁটা ফুটছে বোধ হয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘিরে রেখেছে এই ধাতব বিভেদ রেখা। পাহাড়ের ঢালে অসংখ্য বাঁশের ঘর; একসারি উপরের ধাপে তো অন্যসারি নীচে। প্রবেশ দ্বারে বেশি সময় দাঁড়াতে হল না। সেনারা দুই একটা প্রশ্ন করেই আমাদের গাড়ি বেড়ার ভিতর ঢুকতে দিল। শীতের সকালের মিঠে রোদে তখনও বাজারে কেনাবেচা চলছে। সাধারণ আনাজের সাথে দেখা যাচ্ছে বিদেশী কিছু পণ্য - মূলত প্যাকেটভরা খাদ্যদ্রব্য। একটা বসতির গলির মধ্যে পাহড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলাম। সেখানে ইট বিছিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে। দুই পাশের ঘরগুলোর গা রোদে চক্ চক্ করছে। ঘরে ওঠানামার জন্য পুরুষরা বাঁশ কেটে কেটে সিঁড়ি বানাচ্ছে। চতুর্দিকে কিলবিল করছে অসংখ্য নানান বয়সের কচিকাঁচার দল।

একটা কাঁঠাল গাছের নীচে দাড়ালাম। সেখানে দুইজন নবীনা স্বাস্থ্যকর্মী চোখ পরীক্ষার আয়োজন করছেন। মেয়ে দুটি স্থানীয় বর্মী ভাষা জানে; তাই চোখ, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি নানান সমস্যার পাঁচমেশালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ এরাই করে। ভাষা এখানে বড় প্রতিবন্ধক। কাঁটাতারের বাইরে বাংলা আর ভিতরে বর্মী ভাষা। খাদ্য এবং স্বাস্থ্য কারও জন্যে অপেক্ষা করে না। যে ভাবে হোক সামান্য ব্যবস্থাও যে কোনও ভাবে করে নিতে হয়। সারা পৃথিবী থেকে খাদ্যের সাহায্য আপাতত আসছে, স্বাস্থ্যও রোহিঙ্গাদের ভাষা জানা হাতে গোনা কয়েকজন বাঙালি কর্মীদের দিয়ে টেনেটুনে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ক্যাম্প পরিসরে কিছু কিছু ছোট প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হলেও, হাসপাতালটা ক্যাম্পের বাইরে।

মেয়ে দুটি কাজ শুরু করল। এক বৃদ্ধকে বুঝিয়ে দিল গাছে টাঙানো দৃষ্টি পরীক্ষার ই চার্টে কি পড়তে হবে। কি যে বলল সে ভাষা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু পদ্ধতিটা যেহেতু জানি তাই কি বলছে তা যথেষ্টই আন্দাজ করতে পারলাম। মেয়েটা হাত তুলে হেঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ্যাডে হউয়া? এ্যাডে?" হয়ত এর মানে 'এটা কি?" বৃদ্ধ বলতে পারে না। কি হল? পিছন ফিরে দেখে পড়ানোর চার্টটাই গাছে আর নেই। নিশ্চয় কোনো বাচ্চা নিয়ে পালিয়েছে। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। একটু পরেই চুরির মাল সমেত চোরকে ধরে আনা হলো। দুটো ধমক খেয়ে হি হি করে দুষ্টু হাসি হেসে আবার দিল দৌড়। বাচ্চগুলো করবেই বা কি? স্কুল নেই, পাঠশালা নেই তাই পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো কাজই নেই এদের।

টুং টুং টুং, টুং - হাতে ঘন্টা নাড়তে নাড়তে বাঁক কাধে প্লাস্টিক সংগ্রাহক আসে। বাকের দুদিকে দুটো বিশাল ঝোলা। ফেরিওয়ালার সাথী একটা বছর দশেকের ছেলে, তার হাতে একটা বালতি, তার ভিতরে জলপাই ভরা বয়াম। একটা গাছের নীচে এরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘন্টা বাজাতে থাকে। পিলপিল করে কোথা থেকে ছেলেপিলের দল

জুটে যায়। সবার হাতে একটা কি দুটো ফেলে দেওয়া জলের বোতল। একটা বোতলের বিনিময় মূল্য দুটো জলপাই। ছোট ছেলেটা নুন-মশলা মাখানো জলপাই বয়াম থেকে গুনে গুনে বার করে খবরের কাগজের টুকরোতে সাজিয়ে দেয়। মহানন্দে বাচ্চাদের দল একত্রে জলপাই এর চড়ুইভাতি করে - কেউ খেতে খেতে নাকের জল চাটে, কেউ লালা মোছে।

একটা মাদ্রাসার ভিতরে ছাত্রদের চোখ পরীক্ষার কাজ চলছিল। ভিতরে ঢুকে ছেলেদের লাইন দেখে মনে হলো সারিবদ্ধ নূতন যৌবনের দূত। নরম গোঁফের রেখা, হালকা দাড়ি সহজেই বয়সটা বলে দেয়। চোখের সমস্যা দেখব কি? রোগই তো নেই; দৃঢ় ধনুকের মতন ভ্রু যুগলের নীচে উজ্জ্বল চোখ দুটো যেন কত কিছু বলতে চায়। তখন কাতারে বিশ্বকাপ ফুটবল চলছে–গোটা বাংলাদেশে তাই নিয়ে কী চূড়ান্ত উন্মাদনা যার তরঙ্গ এই তরতাজা কিশোর যুবকদের কাছে আসতে গিয়ে কোথায় যেন অটকে গেছে। আজকাল কতগুলি পরিভাষা কানে আসে জিও-পলিটিক্স, আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কারণগুলোই যেন এই শিশু-কিশোর-যুবকদের ভাগ্যকে বেঁধে রেখেছে।

দুপুর গড়াতেই আমরা ক্যাম্পের বাইরে চলে এলাম। রাস্তার দুই ধারে ব্রাজিল আর আর্জেন্তিনার পতাকা বাতাসে দোল খাচ্ছে। বাচ্চারা একে অন্যের কাঁধে হাত রেখে পিঠে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে স্কুল থেকে ফিরছে - দুটো পৃথিবীর কত তফাৎ! ভিতরে কোন বিদ্যালয় নেই ওদের ভাষায় পড়ানোর শিক্ষকের অভাবে - এমনটাই শুনলাম। তাহলে জীবনের সোনালি দিনগুলো এভাবেই অবহেলার ধুলোর আস্তরণে চাপা পড়ে যাবে?

গাড়ি চলতে চলতে রেজুখালের ঝাউবনের কাছে পৌঁছে গেল। সেই সদা চঞ্চল সমুদ্রে ইতস্ততঃ কিছু সাম্পান শোভা পাচ্ছে। চালককে একটু দাঁড়াতে অনুরোধ করলাম দৃশ্যটা শেষবারের মতন উপভোগ করার জন্য।

বিকেলেই ঢাকা চলে যাব।

-দাদা ডাব খাবেন? মইদুল প্রস্তাব দিল।

-হ্যাঁ, মন্দ হয় না।

ভাবলাম আরও কিছুক্ষণ দাঁড়ানো যাবে তাহলে। এদিক ওদিক তাকাতে থাকলাম যদি জিল্লুকে কোনক্রমে একটু - দেখতে পাই। ও আবার বালি মাখা পায়ে লুঙ্গি সামলাতে সামলাতে দৌড়ে আসবে, ঝপাং করে লাফ দিয়ে উঠে পড়বে কোন এক সাম্পানে। তারপর পাড়ি দেবে দূর দেশে। ভেসে চলবে অনন্ত সমুদ্রে, উপরে অনন্ত আকাশ আর নক্ষত্রদের সাক্ষী করে। সাম্পান তাকে নিয়ে যাবে এমন পৃথিবীতে যেখানে সে রোহিঙ্গা নয়, বাঙালী নয়, বর্মী নয় - শুধুমাত্র জিল্লু, একটা নিষ্পাপ প্রাণবন্ত শিশু।

পীরিতি বসত কুরে যি দিশে
সিথা গিয়া ভিড়াই সাম্পান
আমি চান্দেরই সাম্পান যুদি পাই।

সেলফি

শীতের শেষে একটু একটু গরম পড়তে শুরু করেছে। মালভূমির পাহাড়ি রাস্তার ধারে এখনও কোনও কোনও গাছে পলাশ অবশিষ্ট আছে। রুক্ষ পাথুরে পথ ধরে গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো মুরগাডাঙ্গা গ্রামে। 'নমস্তে, জোহার ডক্টর সাব', গ্রামের মহিলারা কপালে টিকা লাগিয়ে গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। আমার গলায় হলুদ মালা কেমন লাগছিল তা আর আয়নায় দেখার সুযোগ ছিল না। তবে ইন্দ্রনাথকে বেশ লাগছিল। গোলগাল চেহারায় সাদা কুর্তার উপর গাঁদার মালাটাতে বেশ নেতা নেতা মনে হচ্ছিল। আমরা ডাক্তারদের দল কালাজ্বর রোগীদের চোখ দেখতে এসেছি। ইচ্ছা করেই গাড়িটাকে গ্রামের প্রান্তেই রাখা হল - ধুলো উড়িয়ে সাধারণ মানুষের প্রাঙ্গনে পৌঁছানোটা ঠিক মনে হয় নি।

খানিকটা পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ালাম মনিকা টুডুর কুটিরের সামনে। ঝকঝকে নিকনো উঠোন, মাটির দেওয়ালে আলপনার শোভা। বেড়ার ধারে গোলাপি নয়নতারা ফুটে আছে। কুলগাছের ছায়ায় দড়ির খাটিয়া পাতাই ছিল, সাথে রাখা কিছু প্লাস্টিকের চেয়ার। চোখ দেখার জন্য আমাকে মনিকার ঘরের মধ্যে যেতেই হল - একটু আঁধার না হলে যন্ত্রের আলোয় কিছু দেখা যায় না। বাইরে অন্য ডাক্তাররা মনিকার মাকে নানান প্রশ্ন করতে থাকেন ওর চিকিৎসার ইতিহাস জানার জন্য, দেখি মনিকা অস্থির হয়ে উঠল। ভিতর থেকেই চেঁচিয়ে বললো, "মাম্মীকো কুছ মাত পুছিয়ে, উসকো কুছ নেহি আতি হ্যায়।' দৌড়ে বাইরে গিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আবার ঘরে এসে চোখ দেখাতে বসলো।

- পিতাজী কঁহা হ্যায়?
- মছলি পাকড়নে গায়া, বাজারমে মছলি বেচতা হ্যায়।
- মাছ? এই উসর ভূমিতে কোথাও তো জল দেখলাম না।
- পানি কাহা হ্যায়? কাঁহা পকড়তা মছলি?
- এক ছোটিসি নদী হ্যায় হামারে গাঁওমে।

প্রকৃতি তাহলে কিছু করুণাবারি রেখেছে অবশিষ্ট এদের জন্য। মনিকার চিকিৎসার কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে খুব অবাক হয়ে গেলাম, মেয়েটা যে পরিমান দৃষ্টি হারিয়েছিল তার পুরোটাই ফেরত এসেছে এক চোখে, আরেকটা চোখে সামান্য একটা চিহ্ন রেখে গেছে মাত্র। আর নূতন করে দৃষ্টি হারানোর আশঙ্কা নেই। দুই বছর স্কুল যাওয়া হয়নি, এবার ও পড়া শুরু করতে চায় এবং তা ভালো স্কুলে; যাতে ভবিষৎতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে পারে। সরকারি কর্তারা সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। ইন্দ্র আর আমি

দুজনেই আনন্দিত। সফরের শুরুটা ভালই হল, বল?

চিকিৎসা ঠিক মতন হলে দৃষ্টি বাচাঁনো যায় তাহলে।

ধর, যদি এই মেয়েটাই এই এলাকায় কোনদিন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে আসে, তাহলে কেমন হয়?

অসম্ভব নয়। মেয়েটার মনের জোর আছে, সফল হতেই পারে।

তবে খুবই গরিব তো, কতদূর যেতে পারবে কে জানে ? যাই হোক মনিকার আরোগ্য আমাদের আশা জাগালো, উৎসাহ বেড়ে গেল।

এরপর প্রতিদিনই দূর গ্রামে তিন চার জন মানুষের চোখ দেখতে যাই। সবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয় - কেউ এক চোখে কেউ দুই চোখেই দৃষ্টিহীন হয়ে গেছে। বেশিরভাগ রোগীদেরই বয়স কম, বড় কষ্ট হয় ওদের দেখলে। চতুর্থ দিনে গোড্ডা গিয়ে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। বছর কুড়ি-একুশের অর্জুনকে ওর মা হাত ধরে আমার সামনে এনে বসিয়ে দিল। পরনে নীল জামা - একটু তুঁতে রঙের, মুখে কালাজ্বরের কালো কালো ছোপ, দুই চোখের মনি একেবারে সাদা ভিতরে আলো ঢোকার সব পথ রুদ্ধ। অর্জুন মারান্ডির সব কাগজপত্র পরীক্ষা - করে আর চোখটা দেখে মনে হল কর্নিয়া পরিবর্তন করে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। ছেলেটার আদর কাড়া মুখটা আমাদের সবারই মনে খুব নাড়া দিল, যদি কিছু করা যায়।

এর পরের যাত্রা শুরু হল বিহারে। একে একে সারন, ছাপড়া, গোপালগঞ্জ, চম্পারণ, পূর্ণিয়া, আরারিয়া তে শুধু মন খারাপের পালা। অনেকদিন ধরেই ইন্দ্রনাথ আমাকে বলতো যে ওর ফিল্ড ওয়ার্কাররা কালাজ্বর রোগীদের চোখের সমস্যা নিয়ে প্রায়শই খবর পাঠাচ্ছে। বললাম ফোনে ছবি পাঠাতে, সেগুলো দেখে কিছু ধারনা তৈরি হল। দুবছরের বেশি কোভিড মহামারী থাকায় সরাসরি রোগীদের কাছে পৌঁছানো যায় নি। অবস্থার পরিবর্তন হতেই দুই সহপাঠী মিলে কাজ শুরু করেছি। ঝাড়খণ্ডের প্রথম সফরে দলটা বেশ বড়ই ছিল। সাথে কিছু উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তি ছিলেন। তারপর থেকে সময় বের করে দুই বন্ধুতেই বিভিন্ন গ্রামে যাই। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীরা বেশ কর্মঠ, খুব উৎসাহ নিয়ে আমাদের রোগীদের বাড়ি বাড়ি নিয়ে যায়। রাস্তা কোথাও ভালো, কোথাও খারাপ, গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে হয়। তারপর শুরু হয় খোজ খবর নেওয়া। কিভাবে রোগের শুরু? কোথায় কোথায় চিকিৎসা হয়েছে? কি ওষুধ চলেছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। কখনও ওষুধের বাক্সের অবশিষ্ট ক্যাপসুল গুনতে হয়, হিসেব মেলানোর জন্য। চিকিৎসার রেকর্ডপত্র অক্ষত পেলে খুবই সুবিধা হয় রোগের গতিপ্রকৃতি বুঝতে, কিন্তু কারও কাছে ছেঁড়া কাগজের টুকরো মাত্র মেলে, কারও কাছে তাও না।

-পুরজা (কাগজপত্র) কঁহা হ্যায়?

-বাড় আয়াথা (বন্যা এসেছিল) সবকুছ খো গ্যায়া।

কালাজ্বর পতঙ্গ বাহিত রোগ; তাই ছোট ছোট sandfly ঠেকাতে মশারি ব্যবহার আবশ্যক। সরকার থেকে বিনামূল্যে দেওয়াও হয়, কিন্তু কটা? ডোমনি দেবীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, 'মশারি টাঙিয়ে শোও তো রাতের বেলা?' মুখটা নিচু করে বলে, "জি নেহি।"

-কেন?

-একটাই তো মশারি, যে কটা লোক বাড়িতে আছে সবারতো হবে না। ওটা শ্বশুরই ব্যবহার করে।

কাইলু রাম মধ্য ত্রিশের যুবক। কালাজ্বর থেকে সেরে উঠেছে। চোখেও খুব সমস্যা হয়েছিল- চিকিৎসায় ভালো হয়ে গেছে। আমার চোখ পড়ল ওর বাম হাতের দিকে -আঙুল গুলোর কি হলো? আহারে! তিনটে আঙুল অর্ধেক কাটা পড়েছে যে।

-এটা কেমন করে হলো?

কাইলুর স্ত্রী জবাব দেয়, 'কালাজ্বরে দুবছর কাজ করতে পারে নি। লোকের কাছে অনেক ধার দেনা হয়েছিল। পাওনাদারের জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। মনে হচ্ছিল গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই দুর্বল শরীর নিয়েও মুম্বই গেছিল ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে। মেশিন চালাতে গিয়ে সময়মত হাত সরাতে পারে নি - আঙ্গুল বাদ চলে গেছে।'

- সরকারি খোরাক পাওনি অসুখের সময়?

কাইলুর বউ চুপ করে থাকে, অভিযোগের সাহস নেই। কাইলু হেসে বলে, 'ভগবানন কি কৃপা সে জানতো বচ গয়া।'

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম প্রায় নেপাল সীমান্তের কাছে। যাদবটোলার শেষ প্রান্তে মুনিয়া দেবীর ঘর। পৌঁছে দেখলাম আমাদের বসার আয়োজন হয়েছে গোয়াল ঘরটাতে। সেখানে পাতা আছে পড়শিদের কাছ থেকে ধার করে আনা কটা প্লাস্টিকের কুরসি। উঠনের অন্য ধারে বসতঘর, চালে লউয়ের লতার কচি ডগা ঝুলে রয়েছে। কিন্তু তাতে কোনো রকমে মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়; তার ভিতরে গিয়ে চোখ দেখার জায়গা নেই তাই আমাদের ক্লিনিক গোয়ালঘরেই সাজানো হয়েছে। বৃদ্ধার একটা চোখই ভরসা, কিন্তু মুখে কোন কষ্টের চিহ্নমাত্র নেই।

- কি চিকিৎসা হয়েছিল, মাইজি?

ওই মহল্লার ঝোলাছাপ ডাক্তারের দাওয়াই।

- শহরে যাও নি?

- ফরবেসগঞ্জ, পূর্ণিয়া দুটোই অনেক দূরে যে, অনেক ভাড়া লাগে গাড়িতে। গোয়ালের মাটিতে তখন মুনিয়া দেবীর স্বামী লুঙ্গি পরে উবু হয়ে বসা। হাত জোড় করে উপর দিকে মাথা তুলে বলে, 'গরিব আদমি, ডাক্তার সাব।' মুনিয়ার চোখের ছবি

তোলার সম্মতি চাইতে একটা অনুমতিপত্রে সই করতে বললাম। আমাদের ফিল্ড ওয়ার্কার কাজাললতার কালি নিয়ে প্রায় তৈরিই ছিল আঙ্গুটা ছাপের জন্য। মুনিয়া আমার হাত থেকে কলম নিয়ে ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, 'চেষ্টা করে দেখি।'

একটা চোখ পুরোপুরি অন্ধ হলেও অন্যটাতে কাজ চলার মতন দৃষ্টি আছে। তাই দিয়েই মুনিয়া ধীরে ধীরে নাম লিখতে থাকল। কয়েকটা আঁচড়ের পর আবার একটু হেসে কলমটা ফেরত দিলেন। সইটাতে কোন অক্ষরই বোধগম্য হল না না 'ম'না 'ন'। তবুও কালির আঁচড়গুলির মধ্যে রয়ে গেল আআত্মবিশ্বাস আর অস্মিতা।

আমাদের ফিল্ড ওয়ার্কের অন্যদিকে হাসপাতালে আর এক পর্ব চলছিল- অর্জুনের দৃষ্টি ফেরানোর আয়োজন। অনেকদিন একটা ভাল মানের কর্নিয়া সংগ্রয়ের অপেক্ষায় ছিলাম আমরা, অল্প বয়স কিনা। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, শুভ্রা আজ সফল। অপারেশনের পর অর্জুনের দৃষ্টি ফেরত এসেছে। বড় কষ্ট হত ওকে দেখলে। যতবারই অর্জুনকে দেখেছি ততবারই মুখটা গম্ভীর, মায়ের হাত ধরা। মায়ের কোলে সবসময় থাকে একটা ছোট্ট ছেলে, অর্জুনের ভাইপো। নয় মাসের শিশুকে রেখে মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। তাই ঠাকুমা-ই একমাত্র আশ্রয়। দুর্ভাগ্য যেন এদের পিছু ছাড়ে না। কচি ছানাটার একটা চোখ আবার অপুষ্টিতে খারাপ হয়ে গেছে। অন্ধ ছেলে, অসুস্থ নাতিকে সামলেও আশা মারান্ডি যখন একমুখ সরল হাসি নিয়ে 'নমস্তে ডাক্তারসাব' বলে তখন নমস্কার শব্দটা আর কথার কথা থাকে না। প্রানভরে শুভেচ্ছা গ্রহন করতে সম্মানিত বোধ করি।

মাসখানেক হয়ে গেল অর্জুন বাড়ি গেছে, অনেক দূরে থাকে তাই সপ্তাহে অন্তত দুবার খোঁজ নেই কেমন আছে, ওষুধ ফুরিয়ে গেল কিনা। কোন কোন বন্ধু ওর চোখের ছবি তুলে ফোনে পাঠিয়ে দেয়, শুভ্রা আর আমি একটু বড় করে দেখে স্বস্তি পাই ভাল আছে বলে। মাস দেড়েক হয়ে গেলে ও একবার এসে দেখিয়ে যাবে।

মুনিয়া দেবীকে দেখে আমরা পূর্ণিয়া শহরের দিকে ফিরতে থাকি। তখনও বেলা আছে। যাতায়াতের পথে নানান কথা চলতে থাকে। ইন্দ্রনাথ আমার থেকে অনেক বেশি বিহারকে চেনে; ওর কাছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা শুনতে থাকি। কিছুদিন আগেই শ্রাবন গেছে - শিবের মাস। অনেক বাচ্চার গায়ে তখনও - কমলা রঙের 'বোল বম' লেখা গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। ইন্দ্র বলে, না ছেঁড়া পর্যন্ত ওই পোষাকই চলবে। কথার ফাঁকে স্বভাব বশত একটু ফোনটাতে হাত পড়ল। দেখলাম হোয়াটস্‌অ্যাপে নূতন ছবি এসেছে।

আরে! দেখ দেখ, অর্জুন চোখের ছবি পাঠিয়েছে। ভালই আছে।

- দেখি তো, বাহ, বেশ চক্‌চক্ করছে চোখটা।

কিন্তু ওর তো বাম চোখে অপারেশন হয়েছিল। ছবিতে তো এটা ডান চোখ দেখা যাচ্ছে।

‘তাহলে নির্ঘাৎ সেলফি তুলেছে’, ইন্দ্র বলে। আমার আর দেরি সইল না, অর্জুনকে ফোন করলাম।

- ক্যায়সে হো বেটা?

- আচ্ছা হ্যায় ডাক্টরসাব, নমস্তে।

- আজ তুমনে সেলফি ভেজা হ্যায় ক্যা?

- হাঁ স্যার। আভি সেলফি লেনা আতা হ্যায়।

-বহুত খুশি কি বাত হ্যায়, অর্জুন। দাবাই বন্ধ মাত কর না। মাম্মি ঠিক হ্যায় না?

- হাঁ স্যার।

ফোন ছেড়ে দিলাম। সাথে সাথে ছবিটা শুভ্রাকে ফরোয়ার্ড করে দিলাম, দেখো অর্জুন নিজের ছবি তুলতে পারছে।

- দেখ ইন্দ্র, আজকাল লোকের সেলফি তোলার আদিখ্যেতা দেখলে কত বিরক্তি লাগে, কিন্তু আজ কেমন আনন্দ লাগছে।

ইন্দ্র আমার কথাটা শুনল, কিন্তু নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে।

- কৈলাশজী, আগে মিঠাই কা দুকানমে গাড়ি রোক দিজিয়ে।

– মিষ্টি খাবি? অ্যাই, কালই না সুগার নিয়ে এত কথা হলো?

ছাড় ওসব এখন। আজ সেলিব্রেশনের দিন।

শুভদৃষ্টি

চিরকালই পঞ্চইন্দ্রিয়ের দলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বকরা থেকেছে। এদের সাথে হৃদয়ের স্থান কখনও জোটেনি। জুটবেই বা কেন? হৃদয়ের কাজ তো সারা শরীরকে নিরবধি রক্ত জুগিয়ে যাওয়া। তবুও 'দেখা" কি 'দেখা" হয় যদি তাতে হৃদয়ের যোগ না থাকে? যে দেখা দেখলে হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায় সেই তো সত্যিকারের দেখা। প্রিয়জনের দর্শন জগৎ ভুলিয়ে দেয়, সদ্যোজাত সন্তানের গোলাপি আভা মায়ের প্রসব যন্ত্রণা সারিয়ে দেয়। এটাই তো দৃষ্টি।

আমাদের ডাক্তারি করে জীবন চলে তা আবার চোখের। রোগী আসে, রোগী যায়- অনেকটা গতানুগতিকতার নামান্তর। শুধু গুরুজনদের শিখিয়ে দেওয়া উপদেশ মনে রাখি "দেখো কেউ যেন মনে আঘাত না পায়।" চিকিৎসার সাথে সাথে সবার মনের খবর জানার সুযোগ হয়ে ওঠে না। তবুও কিছু জীবনের গভীরে কখনো কখনো গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্ষার আকাশে রামধনু এসে মনকে রাঙিয়ে দেয় আবার তা মিলিয়েও যায়। কিন্তু মানুষের অন্তরের গভীরে খুঁজে পাওয়া গুপ্তধন কখনো হারায় না। বারবার নিজেদের চিকিৎসক বৃত্তিকে ভালোবাসি কারণ সাধারণ মানুষ অকপটে তাদের হৃদয় আমাদের দিয়ে দেয়।

সকালবেলা ওয়ার্ডে ভর্তি-থাকা সমস্ত রোগীদের দেখে ঘরে এলাম। গতকাল যাদের অপারেশন হয়েছে সকলেই ভাল আছে তাই তৃপ্তিতে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। ভালো খবরটা শুভ্রাকেই আগে দিলাম, "তোমার কালাচাঁদ ভালো আছে গো।" ও-ই গতকাল কালাচাঁদের চোখ অপারেশন করেছিল, চিন্তিতও ছিল। অল্পবয়সি একটা ছেলে দৃষ্টি ফিরে পেল-এটা বড়ো আনন্দের। এই আনন্দের রেশ নিয়ে শুভ্রা আবার ওকে দেখে এল। রুটিনমাফিক দিনের কাজের ভিড়ে দুজনেই আবার হারিয়ে গেলাম ।

আমাদের হাসপাতালে তখন তিনজন বিদেশি অতিথি বেড়াতে এসেছেন। তাদের ইচ্ছা হল কোনও একজন রোগীর জীবনকাহিনী সংগ্রহ করা। প্রস্তাবটা আমার কাছে আসতেই কোনও চিন্তা না করে কালাচাঁদকে আমাদের অফিসে নিয়ে এলাম।

এই অবসরে কালাচাঁদের পরিচয়টা দিয়ে রাখি। বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গাতে ঘর এই কালাচাঁদ বাউড়ির। অযত্ন-লালিত চুল-দাড়ি, রং ফিকে হয়ে যাওয়া জামা আর পায়ের বিবর্ণ চটি জোড়া অনায়াসে আর্থিক অবস্থা বলে দেয়। মাঝবয়সি হরিহর কালাচাঁদের অভিভাবক সঙ্গী। ছোটোবেলায় কালা দেখতে পেত। বংশগত একটা রোগ বয়স বাড়ার সাথে সাথে দুচোখের মণি অস্বচ্ছ করে দেয়। নেমে আসে দৃষ্টিহীনতা। এর আগে

ও যে ডাক্তার দেখায়নি তা নয় কিন্তু এই রোগের যে একমাত্র চিকিৎসা সেই মণি পরিবর্তন; সেটা গাঁয়ের গরিব ছেলেটার কাছে অধরাই থেকে গেছে।

কালাচাঁদকে নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হল। প্রশ্ন ইংরাজিতে, উত্তর বাংলায়। মাঝখানে আমি হলাম অনুবাদক। নাম আর নিবাসের পরিচয় আগেই পেয়েছি।

বয়স? - ২৬ বছর

লেখাপড়া? - ষষ্ঠ শ্রেণি। তারপরই ইতি।

কেন স্কুল ছাড়া? - বাপ মরে যাওয়া। কী কাজ করা হয়?

- আগে চাষের জমিতে একটু-আধটু মজুর খাটতাম, এখন আর পারি না।

- কেন?

- চোখে না দেখার জন্য। বড়োভাই দেখে তাই খাওয়াটা জোটে।

এ পর্যন্ত যা জিজ্ঞাসা করা হল এবং উত্তর জানা গেল তা তো খুবই স্বাভাবিক আমাদের গরিব গ্রামবাংলায়। অতএব আমিও গ্রামার শুদ্ধ রেখে অনুবাদ করে গেলাম মাত্র। হটাৎ ঝড়ের মতো একটা প্রশ্নের উত্তর পাল্টে দিল সবকিছু।

Ken জিজ্ঞাসা করল "Ask him, is he married?" কালাচাঁদের বয়স ২৬ বললেও দেখায় কুড়ির মতো। তাই হাসতে হাসতে বললাম, "কালা, ওরা জিজ্ঞাসা করছেন তুমি বিয়ে করেছ কিনা?"

কালাচাদ এমনিতেই চুপচাপ থাকে, হঠাৎ মাথাটা নিচু হয়ে গেল। একি! কোনও অবাঞ্ছিত প্রশ্ন হয়ে গেল না তো? মনে কষ্ট পেল কি?

অদ্ভুত প্রত্যয় মাখানো গলায় হরিহর বলল-"আমি কি উত্তরটা দিতে পারি?" -অবশ্যই। "ওর সাথে আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছিল।''

He is saying that he was married to his daugther- অনুবাদে এই দাঁড়াল। কেন, জ্যাক, পেনি সমস্বরে বলে উঠল "Was? Then what happend?" আমার মনের মধ্যে হাজারটা প্রশ্ন তোলপাড় করে গেল। সত্যিই "Was" মানে তো অতীত। তার মানে তো এই দুটো পুরুষ মানুষের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকার কথাই নয়। তবে রহস্যটা কি?

হরিহরের স্বর একটু গম্ভীর হয়ে এল। "আমার মেয়ের সাথে যখন ওর বিয়ে হয় তখন মেয়ের বয়স সতেরো। বিয়ের রাতেই যখন সে জানতে পারে তার স্বামী দৃষ্টিহীন তখন সে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে। কম বয়সের আবেগ সে সহ্য করতে পারেনি।"

অনেকক্ষণ আমরা মৌন। নিচুস্বরে আমরা আলোচনা করছি "Then why is he caring for this man?" উত্তরটা হরিহরের কাছ থেকেই এল।

"মেয়ে হারানোর ব্যথা অনেক কষ্টে সহ্য করলাম। ভাবলাম সান্ত্বনা কোথায়? তাই স্থির করলাম যেজন্য মেয়েটা চলে গেল সেই কারণটা দূর করার চেষ্টা করি। ডাক্তারদের

সাথে কথা বলে জানলাম কালাচাঁদের চোখের মণিটা পরিবর্তন করা দরকার। বিভিন্ন হাসপাতালে মৃত্যুর পর যে চোখ সংগ্রহ করা হয় তা থেকেই এই অপারেশনটা সম্ভব। তিন বছর ধরে শহরের বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরেছি। কোথাও ভিড়ে বুঝে উঠতে পারিনি কিভাবে এই অপারেশনটা সম্ভব। মণি সংগ্রহ হবার পর কে আমাকে খবর দেবে? কত শীঘ্র গ্রাম থেকে কলকাতায় পৌঁছাব? কিছুতেই সুযোগ - আর হয়ে উঠছিল না। অন্য কিছু হাসপাতালে গেলাম তাতে খরচ প্রচুর- আমাদের সাধ্যের বাইরে। গ্রামের একটা বাচ্চার চোখের চিকিৎসার সূত্রে এই হাসপাতালের খবর পেয়ে এলাম।

তিন বছরের প্রতীক্ষা হলেও কালাচাঁদের ভাগ্য ভালো। যেদিন দেখাল সেদিন বিকেলেই একজোড়া ভালোমানের কর্নিয়া সংগ্রহ হল। ধন্যবাদ মোবাইল ফোনকে। বাড়ি ফেরার মাঝপথ থেকেই কালাচাঁদকে হাসপাতালে ডেকে আনা গেল। পরের দিনই আস্ত্রোপচার।

দীর্ঘ চেষ্টার পর হরিহর আজ সফল। সবকিছু পরিমাপ করারই একটা যন্ত্র থাকে, হরিহরের মানবিকতা মাপার কোনও মাপকাঠি নেই। মনের দুঃখ, ক্ষোভে যাকে পরিত্যাগ করাটাই স্বাভাবিক রীতি তাকেই নূতন জীবনে ফিরিয়ে আনার গরিমা চিকিৎসার সাফল্যের থেকে অনেক বেশি। এ এক উচ্চ জীবনদর্শন।

ভাবলাম কাহিনিটা এখানেই শেষ। কিন্তু আর একটি বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। হরিহরের কথাতেই বলা যাক- "ডাক্তারবাবু, আমি তো তিনবছর ধরে ছেলেটাকে সাথে নিয়ে ঘুরছি কিন্তু আজ এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম যা আমার কল্পনার বাইরে। ও যে আমার মেয়ের ছবি সবসময় কাছে রাখতো জানতাম না। আজ দেখি সকালে জানলার কাছে গিয়ে একা একা সেই ছবির দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে।"

মনের মধ্যে তোলপাড় হয়ে গেল। এই প্রেম, এই মানবিকতা তো শেখানো কোনও আচরণ নয়। এই আপাত সাধারণেতর যুবকটি তো কোনও প্রেমকাব্য পড়েনি, কোনও ভ্যালেন্টাইনস্ ডে পালন করেনি। এর অন্তর যেন কালিদাসের যক্ষের মতো প্রিয়াকে পেতে চাইছে শুধু অন্তর দিয়ে। কালাচাঁদের স্ত্রীর নাম জানা হয়নি। না জানলেই বা- নিশ্চয় রাধা। ছবির রাধা যেন কালার মুখ পানে চেয়ে আছে আর সখীদের গল্প করছে-

"বিবিধ ফুলের মালা যতনে গাঁথিয়া কালা পরাইতে চাহে মোর গলে।।"

এ এক অদ্ভুত শুভদৃষ্টি। এতে পান পাতার আড়াল নেই, মাথার উপর চাঁদোয়া নেই, সানাই-এর সুর নেই, আছে শুধু নীরবতা। এ শুধু হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব, এক পার্থিব হৃদয় থেকে অপার্থিব হৃদয়ে উত্তরণ।

সৌরভ

সারাদিন কাজের শেষে সন্ধ্যার পর ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরলাম। চৈতন্যপুরে আমার আবাসগৃহে আমি এখন একাই থাকি। তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই একটা তীব্র গন্ধ নাকে এল। বাপরে! কিসের থেকে আসছে? আমাদের গৃহকর্ত্রী মাসি মাছ ঘাঁটতে ভালবাসে, এতে ঘর কখনও কখনও মৎসময় হয়ে যায়। তাই কিঞ্চিত মাছের গন্ধে অভ্যস্ত; তবে এই গন্ধটা যে আরও জোরালো। চোখ পড়ল আমার সবসময় ব্যবহারের ব্যাগটার দিকে; ওটার পাশে রাখা একটা কালো প্লাস্টিকের থলে, তার মধ্যে একটা মোটা বস্তায় জড়ানো কিছু একটা। কে রেখে গেল কে জানে? কাকেই বা জিজ্ঞেস করব রাতের বেলা? সকালে মাসি আসলেই রহস্য উন্মোচন করা যাবে, আপাতত বস্তুটি কি সেটা তো খুলে দেখা যাক।

দড়ির বাঁধন খুলতেই দেখি এক তাড়া শুঁটকি মাছ, লম্বা গোছের। শুকনো মাছের প্রতি আমার কোন বিরাগ নেই তাই গন্ধ বেশ জোরালো হলেও কোন কটু বিশেষণ মনে এল না। শুটকির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দুটি দল আছে - অনেকটা মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মতন। চট্টগ্রাম আর সিলেটের মানুষ শুটকি বিনা জীবন কল্পনাও করতে পারেন না। অন্য বাঙ্গালীদের একটা অংশ শুঁটকির 'দুর্গন্ধ' অবলম্বন করে ঐ গন্ধের চেয়েও তীব্রতর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তবে এদের অনেকেই আবার রেঁধে দিলে চেটেপুটে খান।

আপাতত ঘরের গন্ধ একটু কমানোর ব্যবস্থা করা যাক, শীতের রাত - সব দরজা-জানালা বন্ধ। মাছটাকে বারান্দায় রেখে, দরজা খুলে কিছুক্ষণ পাখা চালিয়ে দিলাম। কৌতুহল যেতে চায় না - দিলোটা কে? কদিন আগেই মান্ডবীর বাড়িতে ওর মা সিদল শুঁটকির চাটনী খাইয়েছিলেন। আমার খেয়ে ভাল লাগাতে কি তাহলে উনিই পাঠালেন? কিন্তু এতটা পরিমাণ, প্রায় আধসের খানেক মাছ উনি কোত্থেকে আনবেন? গন্ধ ঢাকার জন্য এত মোটা বস্তা কেমন করে জোটালেন? এত সব জিজ্ঞাসা নিয়েই রাতে ঘুম দিলাম। সকাল সাড়ে ছটা, দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ। দরজা খুলেই প্রথম কথা, "মাসি, মাছ কে দিল গো?"

- ঐ যে ইচ্ছাপুরের কালো মতন মেয়েটা তোমাদের হাসপাতালে কাজ করে, সে রেখে গেল।

কার কথা বলল কে জানে? আমার ঘরে তো চিরকাল সবার অবারিত দ্বার।

- এত শুঁটকি খাবে কে?

- কেন কলকাতার ঘরে নিয়ে যাও সেখানে রাঁধবে।

না গো, তোমার বৌদি এমনিতেই মাছের গন্ধ সইতে পারে না, তার উপর শুঁটকি। আমাকে যদি কেউ ডেকে খাওয়ায় তবেই খাই।

- তোমার বাড়িতে খায়?

- হ্যাঁ, আমারা খাই। রাঁধার সময় গন্ধটা যদিও জোর, খাবার সময় তো ভাল। তা বেশ, তুমিই নিয়ে যেও তাহলে। জিনিসটা নষ্ট হবে না।

-হাসপাতালে আজ অনেক কাজ, সকাল সকাল নীচে নেমে এলাম। সিঁড়ির সামনেই ছিল সুষমা, ওর বাড়িও তো ইচ্ছাপুর।

-তুমি কি আমার ঘরে মাছ রেখে এসেছ কাল?

–না তো, স্যার।

–তবে কে রাখল কে জানে? কোন ইচ্ছাপুরের মেয়ের কথা মাসি বলল বুঝলাম না।

মিনু আমাদের কথোপকথন শুনতে পেয়েছিল।

-স্যার, আমিই রেখে এসেছিলাম।

–কে দিল?

–মনে আছে, গত মাসে চন্দ্রকান্ত বলে একটা বাচ্চার অপারেশন করেছিলেন? ওর বাবা দীঘায় মাছ ধরে, গতকাল এসে দিয়ে গেছে। মনে পড়েছে। লোকটা কেমন শুকনো মুখে উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে থাকতো। ভাল আছে তো ছেলেটা?

- ওর বাবা এখন খুব খুশি। মাছ এনে খুব ভয়ে ভয়ে আমার কাছে জানতে চাইছে, "ডাক্তারবাবু কি শুকনা মাছ খায়? দিলে রাগ করবে না তো?" আপনার কাছে একবার শুঁটকির গল্প শুনেছিলাম তাই বললাম, "দাও আমি পৌঁছে দেব।"

সমস্ত চিন্তাগুলো এক লহমায় বদলে গেল। অনুভব করলাম গত সন্ধ্যার আপাত অসহ্য তীব্র গন্ধের মধ্যে কত শ্রদ্ধা আর ভালবাসার সৌরভ মিশে রয়েছে। এক দরিদ্র জেলে তো তার সবচেয়ে পছন্দের উপহার নিয়ে এসেছে; এর যেন সম্মানহানি না হয়।

মিনু আমাদের শিশু বিভাগের দায়িত্ব পালন করে - একেবারেই মায়ের মতন, ওর আবেগও কম নয়। সামনে মল্লিকা ছিল। বললাম, "কিছু ব্যবস্থা করা যায় না? নিশ্চয়ই আরও কিছু লোক পাওয়া যাবে যারা শুঁটকি মাছ খায়।"

–হ্যাঁ, স্যার। ক্যান্টিনে রান্নার চেষ্টা করি, নাহলে মাসিমার সাহায্য নেব।

–এত ভালবেসে দিয়েছেন, কত দূর থেকে কত যত্নে বয়ে এনেছেন, আমাকে এক টুকরো হলেও মুখে দিতেই হবে।

–কিচ্ছু ভাববেন না, স্যার। আয়োজন ঠিক হয়ে যাবে, আজ আমাদের পিকনিক।

মিনু আর মল্লিকা লাফাতে লাফাতে চারতলায় শুঁটকির আঁটি আনতে ছুটল। সকালটা আজ ভালই শুরু হলো।

ঠিক

ভোরবেলার আনারা স্টেশন, কার্তিকের হালকা ঠান্ডা বাতাস আরাম দিচ্ছে। মিতিনদা রেল লাইনের ধারে আমাকে নামিয়ে দিলেন।

ওভারব্রিজ দিয়েই যাই, কি বল?

যাওয়া যাবে না, নূতন হল তো। এখনও কমপ্লিট হয় নাই। সাবধানে লাইন পার হবেন।

একটা মাল গাড়ি হর্ণ দিল। তবে তো দাঁড়াতেই হয়। পুরুলিয়া এক্সপ্রেস আসতে যথেষ্ট সময় বাকি আছে, তাই তাড়া নেই। অনেক লম্বা ট্রেন, ধীর গতিতে আদ্রার দিকে চলতে লাগল। একে একে আরও কিছু যাত্রীদের জমায়েত হতে থাকল। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন যুবক-যুবতী ছিল। পরণে আকাশি রঙের জামা আর ধূসর ট্রাউজার, পিঠে ব্যাগ আর হাতে জিপিএস যন্ত্র।

"দেখছ, এরা সব নতুন পাইলট, বড় বড় গাড়ি ছুটাবে। মেয়াগুলাও কত ওস্তাদ হয়ে গেল।" মাঝ বয়সি এক পুরুষ যেচে আমার সাথে আলাপ জমালেন।

-ভালই তো।

-ভাল মানে? খুব ভাল। ঘরে বসে ছ্যানা মানুষ করার দিন আর নাই।

এই নতুন বন্ধুর একটু বর্ণনা দেই। মাথায় উস্কো খুস্কো চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি, কৃষ্ণ বর্ণ, ছিপছিপে গড়ন। জামাকাপড়ের সঙ্গে সাবানের বিশেষ দেখা সাক্ষাত হয় বলে মনে হল না। কথাবার্তা টনটনে হলেও পদযুগল কিঞ্চিত দোদুল্যমান।

ট্রেনটা অনেক সময় ধরে চলছে; এবার তার নজর পড়ল আমার দিকে। আমার পকেটে রাখা নীল রঙের মাস্কটা দেখে খুব সন্তুষ্ট।

-এটা ঠিক করেছ। ট্রেনে উঠে পরে নিবে। লোকে মনে কচ্ছে করুণা (করোনা) একেবারেই চলে গেছে। সব বেশী বুঝে। সাবধান হইতে দোষ কি বল? আরে, জাপান-চীনকে দেখে শিখ। মাস্ক পরেই করুণা আটকে দিল। আমেরিকার লোকগুলা কিরকম মইল্ল (মরলো) বল? সব ফটাং ফটাং করে। চীনকে নাকি মারবে? শালা ছোট্ট দেশ কোরিয়ার সেই লোকটাকে আগে ঠান্ডা কর তো দেখি? তবে তো চীন।

বাবা! এর তো জ্ঞানের নাড়ি টনটনে। জাতে মাতাল তালে ঠিক। হঠাৎই বন্ধুর হাত চলে গেল আমার পিঠের দিকে।

-এ টি এম কার্ড পিঠে নিয়েছ কেন? এটা ঠিক নয়।

-এ টি এম কার্ড? কোথায়?

-ঐ তো, লাল রঙের, চকচক করছে।

-ওটাতো লাগেজ ট্যাগ, যাতে অন্য কারও ব্যাগের সাথে বদল না হয়ে যায়।

ও, আসল এ টি এম কার্ড সাবধানে রাখবে, চোর বদমাইশের অভাব নাই দেশে।

ট্রেন পার হয়ে গেল। এবার এগনো যেতে পারে।

-যাও, এক কাপ গরম গরম চা খেয়ে ট্রেনে ওঠ।

-চলি ভাই।

প্ল্যাটফর্মের দোকানের চা সত্যিই খুব ভাল বানিয়েছিল, সকাল সকাল দারুণ উপভোগ করলাম।

ট্রেনের কামরাটা বেশ ফাঁকা, হয়ত রবিবার বলেই। ব্যাগটা উপরের তাকে রেখে পা লম্বা করে বসলাম। 'এ টি এম কার্ড পিঠে' এই কথাটাই বার বার মনে আসতে লাগল। এরকম ভাবনাও ভাবা যায়? তার পরের বাক্য, এটা ঠিক নয়। উপরে বাঙ্কের দিকে বার কয়েক তাকালাম। ধূসর রঙের ব্যাগটার হাতলে টুকটুকে লাল রঙের লাগেজ ট্যাগটা একটু বেশিই চোখে পড়ছে। তাতে আবার আমার নাম লেখা। কোন কালে এমিরেটস এর বিমানে চড়েছিলাম তার ট্যাগটাকে এখনও সযত্নে ব্যবহার করে যাচ্ছি। এটা কি কেবলই ব্যাগ চেনার উপায়? একটা স্মারক চিহ্ন? না কি তাতে কিছু আভিজাত্যের গন্ধ থেকে যাচ্ছে? মনে হল, এটা ঠিক নয়। উঠে দাঁড়িয়ে ট্যাগটা খুলে ফেললাম। ব্যাগের থেকে বিদায় নিল এ টি এম কার্ড। মনের আরাম বোধ করলাম। এবার ব্যাগটা পুরুলিয়ার ট্রেনের যাত্রী। এখন ঠিক আছে।

উৎসব

ফলকনুমা এক্সপ্রেস খড়গপুরে দাঁড়ালো। একজন খাকি পোশাক পরিহিত ছোটখাট চেহারার ভদ্রলোক স্লীপার কোচে এসেই সটান উপরের বার্থে উঠে শুয়ে পড়লেন। সাথে গোটা দুই থলে, তারমধ্যে একটা কিছু যেন নড়াচড়া করছে। আমি উল্টোদিকে লোয়ার বার্থে জানালার ধারে বসে চোখের সামনে যা পড়ছে তাই অবলোকন করে চলেছি। হঠাৎ কানে আপাত অদ্ভূত একটা স্লোগান এলো, 'জয় শ্রী রাম, ইনকিলাব জিন্দাবাদ', তখন বিপ্লবের স্লোগানে আমরা বাঙালিরা খুবই অভ্যস্থ ছিলাম; রাম নাম সবে বাতাসে ভাসতে আরম্ভ করেছে। তবে এই দুটো জয়ধ্বনি একেবারে বিপরীত আদর্শের দুই দলের সম্পত্তি - অভিনব ককটেল হয়ে গেল যে। অবশ্যই সেটা ককটেল শব্দটি যে পানীয়ের সঙ্গে খুব চলে তারই দ্রব্যগুনেই সম্ভব হয়েছে। কোন সময়ের কথা বলছি পাঠক নিশ্চয় তা আন্দাজ করতে পারছেন। আরও দুবার রাম-বাম জয়ধ্বনি একই ভাবে উচ্চরিত হলো। নবাগত যাত্রী এই মন্ত্রযুগল জপতে জপতে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই হল ভারতীয় রেলের সাধারন কামরা - বৈচিত্র্যে ভরা ।

খট খট খটা-খট্ - ট্রেন লাইন বদল করে চলতে শুরু করল। প্রত্যাশামত কিছুক্ষণ বাদেই টিকিট পরীক্ষক এলেন নবাগত যাত্রীদের হিসেব নিতে। খাকি পোশাক পরা ঘুমন্ত যাত্রীকে একটু ধাক্কা দিয়ে বললেন, "টিকিট দেখি?'' উনি দেখালেন রেলের পাস।

– এ তো পাস। টিকিট কোথায়?

– দেখে নাও। আর একটা কাগজ হাতে ধরিয়ে দেয়।

– কি নাম?

– কালিয়া সিং, লোকোশেডের ইস্টাফ।

– তোমার টিকিট তো এসি কোচে, স্লিপারে উঠেছো কেন?

– ধ্যার! পালবাবু গোলমাল করে দিল। বললাম জাজপুরের টিকিট কাটতে, কি সব বেকার কাম করে শালা।

- এসি? কৌন চাড়েগা এসিমে?

– তুমি তো এসি ক্লাস এনটাইটেল্ড। রিটায়ার করার আগে একটু আরামে যাও।

– ছোড়ো ফালতু বাত, আরাম হারাম হ্যায়।

– যাবে না তাহলে? যা হোক এখানে ঝামেলা করোনা যেন। কালিয়া সিং ঘুম দিলেন। মাথার কাছে দুটো ব্যাগ; ব্যাগ মানে একটা চটের আর অন্যটা নাইলনের বাজারের থলি। একটার মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু একটা নড়ছে মনে হল।

সেই দিনটা সম্ভবত এপ্রিল মাস ছিল। যত দুপুর বাড়ছে ততই জানালা দিয়ে গরম হাওয়া আসছে, তবে অসহ্য নয়। আমি বইয়ের পাতায় চোখ রেখে সময়ের সৎব্যবহারের চেষ্টা করে যাচ্ছি। কখনো কখনো দুই একজন সহযাত্রীর দিবানিদ্রার নাসিকাগর্জন কানে আসছে। আমারও ঘুমানোর লোভ হচ্ছিল, তবুও চেষ্টা করলাম জেগে থাকতে যাতে রাতের ঘুমটার ব্যাঘাত না ঘটে, দিনে ঘুমালে রাতে ঘটতি।

ট্রেন বালেশ্বর ছাড়ালো। কালিয়া সিং চোখ মেললেন। নেশার প্রভাবে যতটুকু ঘুম হতে পারত তাকে মনে হয় কমিয়ে দিল ছাদের গরম। নীচে একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে সাহেব আমার পাশে বসাটাই বোধহয় পছন্দ করলেন। ঝপাং করে মেঝেতে নেমে থলে দুটোকে সিটের নীচে ঢুকিয়ে দিলেন। মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে অনুমতি চাইলেন, 'বসতে পারি?'

- হ্যাঁ হ্যাঁ বসুন, আমি একটু সরে বসলাম। ভরদুপুরে গল্প করার লোক জুটে গেল - এই বা কম কি? ভালই তো। কালিয়াবাবু বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া তিনটেই বলেন; অতএব কথা বলার অসুবিধা নেই।

– এসিতে যেতে বলছে, সারাজীবন রেলের পাটরীতে রোদ আর গরমে কেটে গেল। এসি কা জরুরৎ হায় ক্যা? কেয়া বাবু? যখন ইস্টিম ইঞ্জিন ছিল তখন আরও কত গরমে কাজ করেছি। এসি কা পসিঞ্জার বহুত শিকায়ত করতা হ্যায়।

- কিসের শিকায়ত?

ওই বিড়ির গন্ধ, ময়লা জায়গা। সব পর্দা টেনে জেলের কুঠরি বানিয়ে শুয়ে থাকে।

- ঠিকই বলেছ দাদা।

– সাহি বলা না! কেয়া বাবু।

- বিলকুল সাহি

কালিয়া বিড়ির কৌটো বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'লো, পি ও।'

- না না, আমার চলে না।

–তাহলে আমি একটু দম নিয়ে আসি। একটা বিড়ির সামনে ও পিছনে সশব্দে আদরের চুম্বন দিয়ে কালিয়া দেশলাই হাতে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করতে চললেন।

- আমার ব্যগটা দেখবে বাবু, মুরগি পালিয়ে না যায়।

- ও, ব্যাগের ভেতর তাহলে মুরগি? তাই নড়ছে, যাও টেনে এসো।

দম দিয়ে আবার এসে আমার পাসে বসলেন সিং সাহেব। শুরু করলেন নিজের কথা। কেওনঝড়ে বাড়ি। দেশে স্ত্রী থাকেন। মেয়েদের অনেকদিন বিয়ে হয়ে গেছে। দেশে পরব মানাতে যাচ্ছেন। রেলের চাকরি আর দুবছর আছে তারপর বুড়োবুড়ি গ্রামে একসাথে থাকবে।

- আজকাল ছেলে ছোকরারা দারুর ইজ্জত বোঝে না।

- সে কি ? কোন পুজো হলেই তো মদ খায়, না হলেও খায়।

- মেহনত করে কি? আমরা লাইনে ভারী ভারী স্লিপার সরাই, সাহেবের ট্রলি ঠেলি, কাজের শেষে একটু দারু চালিয়ে দিই - সব থাকান খতম। আজকাল ছেলেদের দেখ একটু কাজ করলেই পায়ে ব্যথা, গায়ে ব্যথা শুধু শুয়ে থাকবে। সির্ফ মজাক কে লিয়ে দারু পিনেসে চলেগা? উসকা ভি ইজ্জত হ্যায়। মদ্যপানের এক মূল্যবান দর্শন শুনলাম। কালিয়া সগর্বে জামার হাতা সরিয়ে বাইসেপস দেখায়। সত্যিই তো গর্বের এই পেশিতে লিখিত আছে দেশের ইতিহাস।

যে পরবে কালিয়া বাড়ি যাচ্ছিল তার নামটা এতদিনে ভুলে গেছি। খুব আপশোস হচ্ছে। এর কয়েক বছর পর থেকে আমার ওড়িষার সাথে নিয়মিত যোগযোগ শুরু হয়। কালিয়ার সাথে আলাপ হওয়ার আগে যদি কলিঙ্গদেশ চিনতাম তাহলে হয়ত ওদের পরব সম্পর্কে আরও খুঁটিয়ে জানতে চাইতাম। উৎসব মানেই তো বৈচিত্র্য আর স্বকীয়তার মিলন। এবার কালিয়া বাবু মুরগির ব্যগটা হাতে নিয়ে মুখটা ফাঁক করে 'কুকুর কুকুর কু ... বলে আদরের সম্বোধন করে আবার মুখ বন্ধ করে সিটের নীচে চালান করে দিলেন।

–তোমাদের দেশে তো মুরগি আর ভালো পাওয়া যায়, খড়গপুর থেকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

–এই মুরগি পূজায় বলি দেওয়া হবে। ডান হাতের তর্জনীকে নিজের গলার বাম থেকে ডান দিকে ছুরি চালানোর মতন টেনে বলির পদ্ধতিটা আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন।

- দুটোই বলি হবে?

- হ্যাঁ, এরপর মাংস রান্না হবে। জামাই-মেয়ে, নাতি-নাতনি সব খাবে।

- কেন তুমি খাবে না?

- আমি? পুরানা দোস্ত লোগকে সাথ মহুল পিয়েঙ্গে। সবকে সাথ মিলনা চাহিয়ে না, কেয়া বাবু?

- একদম ঠিক। বন্ধু ছাড়া পরব হয়?

– এই দেখ, এতটুকু বাচ্চা মুরগি এনে আমার খড়গপুরের ঘরে বড় করেছি। আচ্ছা আচ্ছা দানা খিলায়া - তব না আচ্ছা টেস্ট বনেগা। কেয়া বাবু?

এবার কালিয়া অন্য থলেটা থেকে দুটো শাড়ি বের করে আমাকে দেখায়। একটা লাল-হলুদ, অন্যটা লাল-সবুজ ছাপা শাড়ি। উৎসবে উপহার দেবে।

- কার জন্য কিনেছ নতুন শাড়ি?

- দো বেটি কে লিয়ে।

- আর কারোর জন্য কিছু কেননি, ওরা দুঃখ পাবে তো।

শূন্যে ডানহাতের একটা ঝটকা দিয়ে বলে, 'ছোড়ো ইয়ার'।

- মেয়েদের কতদিন বিয়ে হয়েছে?

- অনেকদিন, শোনো, ঘিয় (ওড়িয়া ভাষায় ঘি) আর ঝিয় (মেয়ে) ঘরে বেশীদিন রাখলে দুর্গন্ধ ছাড়ে, তাই মেয়েদের জলদি বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। তোমাদের মেয়েরা লেখাপড়া করে, চাকরি করে, তোমাদের কথা আলাদা। কেয়া বাবু?

এবার কালিয়া সিং জানালা দিয়ে বাইরে কিছুক্ষণ তাকালেন। ট্রেনের গতি কমতে লাগল, জাজপুর আসছে। এতক্ষণ আমাকে একটাও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেননি আমার সহযাত্রী, এবার করলেন।

- শাদি হো গিয়া না আপকা? কেয়া বাবু?

- হাঁ, হো গিয়া এক সাল হুয়া।

তব বোলনা চাহিয়ে এ শাড়ি কিসকে লিয়ে? হয়ত ওর কেনা কাপড়দুটোর আর ও তারিফ প্রত্যাশা করছিল কালিয়া। আবার থলের থেকে নূতন শাড়ি দুটো অর্ধেক বার করে দেখায়। কুইজের প্রশ্ন আমার জন্য, 'বোলো কিসকে লিয়ে?' উত্তর দেই, "আপকা দো বেটি কে লিয়ে বহুত আচ্ছা শাড়ি খরিদা আপনে।" লিড ধরতে পারিনি, উত্তর ভুল, নাম্বার কাটা গেল।

- নেহি সমঝা, বচ্চা হ্যায়! ইয়ে শাড়ি বেটি কে লিয়ে নেহি, বেটি কা মা কে লিয়ে। বিড়ি খাওয়া কালো ঠোঁট দুটোর মাঝে সাদা আধভাঙা দাঁতগুলো বিস্ফরিত হয়ে উঠল এক স্বর্গীয় হাসিতে। দুটি আঙুল মুখে পুরে উচ্চস্বরে একটা সিটি বাজিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে কালিয়া সিং বিদায় নিলেন। জাজপুর স্টেশনে উৎসবের বাঁশি বেজে উঠল। কেয়া বাবু!